টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা

মহাশ্বেতা দেবী

প্রমা প্রকাশনী
৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ | কলকাতা-১৭
৫৭/২ই কলেজ স্ট্রীট | কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬৫

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

প্রকাশক
সুরজিৎ ঘোষ | প্রমা প্রকাশনী
৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ | কলকাতা-১৭
মুদ্রক
বিশ্বনাথ পাত্র | সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন | কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট | কলকাতা-৬

ভারতে আদিবাসী জগৎ এক পিরথা ব্লক, সেই
কথা মনে রেখে শঙ্কর নাগোসিয়াদের—

ব্লক আপিসে বসেই পূরণ সহায় এই অশরীরী আতঙ্কের কাহিনী শোনে।

পূরণ সহায়ের নাম ওর পিতামহ রেখেছিলেন প্রার্থনা পূরণ, কেন না পূরণের মার পর পর কন্যা জন্মাচ্ছিল. পূরণের পিতা সে সময়ে কংগ্রেস সেবাদল ছেড়ে সবে কম্যুনিস হয়েছেন এবং পুত্রার্থে দ্বিতীয় বিবাহে ঘোরতর অরাজী,—তখনকার দিনে সেটা বিদ্রোহই বলা চলে।

পূরণের মা অবধি তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন. তুমি আরেকটা বিয়ে করো। ছেলে না হলে কি বংশ থাকে? পূরণের বাবা বলেছিলেন, কম্যুনিস হয়ে আমি আরেকটা বিয়ে করতে পারব না।

—মেয়ে তো বংশ রাখবে না।

—ছেলে আর মেয়ে আমার কাছে সমান। মেয়েদের পড়াব, ওরা মানুষ হবে। মেয়ের বাপ হওয়া আমার কাছে খুব গর্বের।

ছেলে অবাধ্য. কিন্তু বংশরক্ষার্থে পুত্র চাই। তাই পিতামহ ভারতে চার তীর্থ দর্শন করে প্রার্থনা জানিয়ে আসেন। এতসব কাণ্ডের পর পৌত্রের জন্ম। তাতেই নাম প্রার্থনা পূরণ রাখা হয়। ওর বাবার বন্ধুদের মধ্যে পত্রকার, কবি, এঁরাও বাড়িতে আসতেন। এঁদের কথাবার্তার কিছু ছাপ পড়তে পারে নামকরণের পিছনে। পিতামহ গতাসু হবার অনেক পরে ও নিজেই যখন পত্রকার, প্রাক্তন সমাজসেবী ও স্বাধীন, তখন নামটি বদলে নেয়।

কোনটি বাদ দেয়। কোনটি রাখে। বড় সমস্যা। "প্রার্থনা" নাম তো মেয়ের নাম হয়ে যায়, বউয়ের নাম ছিল অর্চনা। তাই 'পূরণ' নামটি রেখে নিল।

বউ খুব সপ্রতিভ ছিল। বলত, মেয়ে হলে প্রার্থনা নাম রাখব। —অর্চনার কোলে প্রার্থনা আসেনি। এসেছিল অর্জুন। কিন্তু অর্জুন আসবার পরই একলামশিয়া হয়ে অর্চনা চলে যায়।

পুরণ আর বিয়ে করেনি। অর্জুন তার মামা বাড়িতে কিছুকাল কাটিয়ে পুরণের মার কাছে ফিরে আসে। 'মা' বলতে দেয়ালে হাস্যমুখী অর্চনার বিবর্ণ ছবি। অর্জুন এখন পনেরো বছর বয়সের না-কিশোর না-যুবক এবং 'উদ্যোগ' বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। পুরণের মা পঁচাত্তর বছরেও শক্ত গৃহিণী। স্বামী ও শ্বশুরের রেখে যাওয়া টাকা এবং কদমকুয়ার বাড়ি রক্ষা করছেন। পুরণের বিষয়ে ওঁর ভরসা নেই। অর্জুনের বিশ বছর হলেই বিয়ে দেবেন।

পুরণের বাবার মতো পুরণও জেদী। অর্চনার মৃত্যুর পর ও আর বিয়ে করেনি। যদিও এখন, প্রৌঢ় বয়সে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়।

পুরণের দিদি পাড়াতেই থাকেন, তাই মা একেবারে নির্ভরসা নন। 'পাটনা দিবসজ্যোতি' (যা আগে ছিল 'পাটনা ডে লাইট') দৈনিক-সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের পত্রকার পুরণ তাই ঘুরতে পারে যথেচ্ছ। এখন ওর, দিদির অবিবাহিতা শিক্ষয়িত্রী ননদ সরস্বতীকে বিয়ে করতে সাধ যায়। বিয়েটা আগে করলে হয়ে যেত। এখন অর্জুন বড় হচ্ছে, সরস্বতী ও পুরণের মধ্যে সংকোচের আড়াল এসে গেছে। অর্জুন কী বলবে তা পুরণ জানে না। ইংরিজি মিডিয়ামে পড়া, কারাটে-আসক্ত, হকি খেলোয়াড় অর্জুন ওর কাছে অচেনাই ছিল। সহসা বিজ্ঞান ও অঙ্কের কুইজে ওর মাথা খুলে যাওয়াতে ও আরোই দুর্বোধ্য হয়ে গেছে।

পুরণ বুঝতে পারে ও এখানে-ওখানে গেলে ও বাড়ির কোনো স্থান শূন্য হয় না, কেন না ও বহুদিনই থেকেও থাকে না। মা

অর্জুন-গীতা শ্রবণসংসার—পাটনা নিবাসিনী দুই মেয়ে নিয়ে মোটামুটি পরিপূর্ণ। অর্জুনের নিজস্ব জগৎ তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। দিদিরা যথেষ্ট দূরের মানুষ। পুরণ পুরুষ কিন্তু তর্জনে গর্জনে প্রতাপে উত্তাপে পৌরুষ জাহির করে না. এটা দিদিদের কাছে খুব দুর্বোধ্য। সরস্বতীও বোঝে, পুরণের সঙ্গে ওর আসলে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সরস্বতীও নিজেকে অপচিত বোধ করে। যেন জীবনটা ভেসে গেল ছট পরবের অর্ঘ্যের মতো, যা সূর্য নেয় না, নদী খায় না, মানুষ বা অন্য প্রাণীর ভোগে লাগে না, শুধু ভেসে যায়, ভাসতে ভাসতে পচে যায়।

এই যে কোথাও একটা মাংসল, ক্ষুধার্ত, পিপাসু মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠল না, সরস্বতীর চোখ বলে, এটা তোমার ব্যর্থতা। পুরণ সেটা মানে এবং পঁয়তাল্লিশ বছরে পেঁছে ওর নিজেকে আধা-মানুষ মনে হয়। এই নৈতিক প্রশ্নও জাগে, সংসারে যে ভাসমান, মা-ছেলে-সরস্বতী, কারো সঙ্গে যে মানবিক সম্পর্ক গড়তে চেষ্টা করেনি, সে কেমন করে পত্রকার হিসেবে সুবিচার করবে বিষয়টির প্রতি?

অথচ সাংবাদিক হিসেবে ওর আরোয়াল সংবাদও প্রশংসা পেয়েছে, অন্যদের মতো পুরণও পাটনায় কোপ দৃষ্টিতে পড়েছে। বানাঝির কথাও ও ধারালো কলমে লিখেছিল। কালো চামড়ায় লাল রক্ত, না আগুনের ফুলকি? এ ছাড়াও নালিপুরায় জল দুর্ভিক্ষ। হটাওরিতে আন্ত্রিক। ভাগলপুরে বন্দীদের অন্ধ করা,—'দিবস জ্যোতি' গ্রুপের মালিক এক শিল্পপতি, পাঞ্জাবি. বিহারের রাজনীতিক প্যাঁচের ঘূর্ণাবর্ত বা জাতপাতের প্রাগৈতিহাসিক লড়াই, এসব ওঁকে বিচলিত করে না। সব রাজনীতিক দলকে পয়সা দেন। সর্বত্র খুঁটি আছে ওঁর। কাগজ ওঁর কাছে ব্যবসা। জাত পাতের সংঘর্ষ লিখলে যদি কাগজ কাটে তো

কার্টুক। ও'র কিছু হবে না। রাঁচিতে শিল্পোদ্যোগ, দিল্লী ও বিহারে খুঁটি, পাটনায় কাগজ। সবচেয়ে পয়সা দেয় 'কামিনী' নামক নারী + চিত্রলোকের সচিত্র পত্রিকা। খুদখুশি বা আত্মহত্যার খতিয়ানের পাশেই 'ঘর কে লিয়ে' পৃষ্ঠায় রান্নার খবর। জগৎ-গুরুর বিদেশ ভ্রমণের পাশেই যৌন বোমা তারকার জবানীতে 'মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ',—এমন সব মিশ্রিত চাওমিন।

এই জীবনেও পূরণ যেন শিকড় খুঁজে পাচ্ছিল না। নিজেই বুঝতে পারছিল ও ভয়ংকর পেশাদারী হয়ে যাচ্ছে। তদন্তমূলক সাংবাদিকতা করছে, কিন্তু তারপরেই 'বিহার পর্যটকের স্বর্গ' লিখতে বাধছে না। বাবার কম্যুনিস্ট আদর্শবাদে বিশ্বাস ছিল। জীবনটা ভাসমান ছিল না। পূরণ তো নিজেকে নিয়েই খুশি থাকতে পারছে না। যা চেয়েছে তাই করেছে। কিন্তু প্রাপ্তির তৃপ্তিবোধ কোথায়?

সে কারণেই পিরথায় আসা। আসার আগে ওকে চমকিত করে সরস্বতী বলেছিল, আমি আর বৃথা অপেক্ষা করব না।

—কী করবে?

—চলে যাব কোনো আশ্রমে, যেখানে স্কুল আছে।

—এখনি তো নয়?

—নয় বা কেন?

সরস্বতী স্মিত হেসে বলেছিল। সে সময়ে ও অনেক দিনই শাদা ধরেছে। শাদা কাপড়ে, শাদা জামায়, লম্বা বেণী ও ক্লান্ত কালো চোখে ওকে 'সরস্বতী চন্দ্র' বিয়োগান্তক ছবিতে (ওরা দুজনে দেখে) নূতনের মতো দেখাচ্ছিল, 'চন্দন কা বদন চঞ্চল চিতবন' গানের সুর বাজছিল মনে।

—সরস্বতী, আশ্রম কেন?

—বত্রিশ বছর বয়স তো হল।

—আমাকে ফিরে আসতে দাও।

—আমি না থাকলে তোমার জীবন কিছু শূন্য হবে না।

—আমাকে আরেকটু সময় দাও —আঠারো বছর বয়স থেকে তোমার মুখ চেয়ে আছি। বাড়ির সঙ্গে লড়াই করে। ছোট বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। এতকাল পরে···আমিও খুব ক্লান্ত।

—শুধু এবারটা সরস্বতী!

শুধু শাদা পরে সরস্বতী। যেন বৈধব্য এসে গেছে।

—এবারটা শুধু···

–কথা দিতে পারছি না।

সরস্বতী কোনোদিন চলে যেতে পারে এই উদ্বেগ নিয়ে এবার পূরণ পিরথা এসেছে। জেলাটি মধ্যপ্রদেশে. ব্লক পিরথা। যেতে হবে দূর গ্রামগুলিতে যেখানে জেলার এগার লক্ষ সাত হাজার তিনশো একাশি মানুষের মধ্যে আশি হাজার আদিবাসী থাকে। পিরথাতে দীর্ঘদিন লোক মরছে। তা ভূপাল গ্যাসের পর যে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব বিলাসবহুল মকান বানায়, সে পিরথাকে 'দুর্ভিক্ষ এলাকা' বলে ঘোষণা করবে না। কিন্তু পুরনো বন্ধু হরিশরণ এখন ব্লক অফিসার, সে লিখেছিল: এসো, দেখে যাও, সরকারি ভাষায় 'নো স্টোরি' কিন্তু সুরজ প্রতাপের রিপোর্টটা পাঠালাম, ওর ভিত্তিতেই চলে এসো।

সেই জন্যেই আসা, এবং পত্রিকার বিষয়ে পিরথা ব্লকে কেন, জেলাতেই যে একটা বিদ্বেষ জমে উঠেছে তা মাধোপুরেই পূরণ বুঝেছিল। এস. ডি. ও. বললেন, পিরথাতে কেন যাচ্ছেন? কিছু নেই সেখানে। আদিবাসী ইলাকায় আর দেখার কিছু নেই। দেখলে তো কাগজে হাল্লা উঠাবেন, আরো পত্রকার আসবে। কিছু চেঁচামেচি হবে।

—তাতে তো আপনাদের এসে যায় না কিছু।

—আপ সমঝতে নেহি। কিছুতে কিছু এসে যায় না কারোই এখন। কিছুই হয় না কারো। দেখুন, দেখুন এটা।

জরিপে পিরথা ব্লকের ম্যাপটি গন্ডোয়ানা ভূমির কোনো বিলুপ্ত জন্তুর মতো। জন্তুটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মেসোজোয়িক যুগের শেষে ভারতবর্ষ যখন মূল গন্ডোয়ানাল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে আসে, পৃথিবীর ইতিহাসে তখন থেকেই নতুন যুগের শুরু। সে সময়ে যেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী মুখ থুবড়ে পড়েছিল। পিরথা ব্লকের জরিপ রেখা তেমনই।

—দেখে যান। কেমন, জানোয়ারের মতো দেখায় না?

—হ্যাঁ। তবে এসব জানোয়ার তো নেই।

—কে জানে!

তরুণ এস. ডি. ও. মাথার চুল টানে।

—এক ভূপাল গ্যাস থেকে তো সত্যনাশ হল।

—কেমন করে?

—ভূপাল নিয়ে চলল কথা। আর ভূপালে যখন গ্যাসের ব্যাপার, তার মধ্যেই পিরথা ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলতে দিল না সরকার, আর আদিবাসী ইলাকা থেকে আন্ত্রিকের রোগীদের টাউনে আনছিল। এস. ডি. পি. ও গুলি চালালো অন্ধকারে, তিন জন মরে গেল। আন্ত্রিক রোগ তো হল জলের ট্যাঙ্ক থেকে। আমরা জল পাঠালাম, জল আসছে, আসছে, ট্যাঙ্ক পেঁছাল না। ট্রাক, ট্যাঙ্ক সব উধাও। যে কুয়ো আমি নিজে পাহারা রেখে আসি তার পাহারাদারকে মারকে হঠাই, ঔর পানি পী লি, বাস! আন্ত্রিক!

—আপনারা কী করলেন?

—হাংগামা থামাতে পুলিশ পাঠালাম।

—আর পুলিশ?

—আরে পত্রকার! পিরথা তো কৃষিভূমিও নয়, এখানে কোনো লড়াইও নেই। পুলিশ এমন আদিবাসী ইলাকায় কী করে?

—আন্ত্রিকটা এল কোথা থেকে?

এস. ডি. ও. হিংস্র আনন্দে হাসে।

—বারিষ যখন হয়, পাহাড় গড়িয়ে জল পড়ে। কেমন করে জানব কোনো বিষাক্ত কিছু জলের সঙ্গে এসেছিল কি না।

—বারিষ হয় তাহলে ?

—মাঝে মাঝে হয়। নইলে ওরা বেঁচে আছে কী করে ?

—সরকার কোনো সাহারা দেয় না ?

—কী সাহারা ? কী সহায় ? এই ম্যাপটা দেখুন। জন্তুটার পায়ের কাছে একটি গির্জা আছে, মিশনারীরা নেই। ওই গির্জা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণে আমরা আছি। আর মাধোপুরা সেচ প্রকল্প থেকে জন্তুটার লেজ থেকে মাথা বরাবর কানাল চলে যেত। প্রকল্প সূচিতে আছে। ওই কানাল পিরথা নদীর সঙ্গেও জুড়ে যেত। আর এখানে দেখুন।

—দেখছি তো।

—জন্তুটার চোয়ালের মধ্যে আদিবাসীরা আছে। গলার কাছে বর্ষায় পিরথার জল তোড়ে নামে। তিন মাইল ডাউনে একটা, তার এক মাইল ডাউনে একটা জোড় বাঁধ পড়লে পিরথার আদিবাসী ইলাকা সবুজ হত।

—এটা হয়নি ?

—না এগার বছর আগে স্বাধীনতা দিবসে খুব ধুমধাম হল। এখান থেকে খাবার গেল। ক্যাম্প পড়ল, মন্ত্রী এলেন, উদ্বোধন হল, অনেক পত্রকার এসেছিল।

—আমি আসিনি।

—শুরু যেখানে, শেষ সেখানে।

—আর এগোয়নি ?

—না না, শুরু হলে তো এগোবে। পর পর তিনজন এস. ডি. ও. চেষ্টা করে গেছেন, কিন্তু মাধোপুরা আর ভূপালের মাঝামাঝি এই ফাইলগুলো হারিয়ে যায়। সব সময়ে হারিয়ে যায়। ফাইল

যদি হারায়…

—এখনো হয়নি তো ?

—না। আর হবেও না। এখন শুনছি, পিরথায় জল অনেক। একটা জলহীন এলাকাকে জল সারপ্লাস বলে দিলে আমাদের হাতে কিছু থাকে না।

— কে বলছে ?

এস. ডি. ও. সম্ভবত বদলি হয়ে যাচ্ছে।

—ধরে নিন কেউ খুব বর্ষায়, শাওন চাই ভাদোতে পিরথা নালা দেখতে গিয়েছিল, আর তখন তো অমন চেহারা ওখানকার। দেখলে মনে হবে না জলের কোনো কষ্ট আছে।…পত্রকার! জল রুখা এলাকা দেখবার টাইমটা এরা বর্ষাকালে ফেলে কেন ? পিকনিক বাস্কেট নিয়ে গেলে ওখানে খুব আনন্দে কয়েক ঘণ্টা কাটানো যায়। সবাই তো পিরথার মতো নালার ব্যাপারটা বোঝে না। সরকার আনল বিশেষজ্ঞ টীম। তারা গেল বর্ষাকালে। বাস্, বলে দিল পিরথায় অনেক জল। কিছু করা যাবে না।

—আপনারা তো আদিবাসী উন্নয়নের টাকায় রোড করেন, বাংলা বানান, বেশ কয়েক বছর।

—আপনার কাগজ কত ছাপা হয় ?

—পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর হাজার। দেয়ালিতে এক লাখ। কোনো ঠিক থাকে না।

—তাহলে আর সুধাবেন না। কী লিখবেন ? কতজন পড়বে ? আমার সরকারের ওপর কতটা চাপ আসবে ? চা নিন।

—আর চা খাব না।

—পত্রকার আর লেখক আর কবিরা তো খুব চা খায়, দারু পিয়ে, বহোত্ নাশা করে।

—সবাই কি এক রকম ? সব এস. ডি. ও এক রকম নয়।

সব পত্রকার এক রকম নয়। সুরজপ্রতাপ আর আপনি তো এক রকম নয়।

—তা কেমন করে হবে।

পুরণ অন্যদিকে মুখ ফেরায়। বোগনভিলিয়াতে ঢেকে গেছে মহকুমা শাসকের আপিসের বাগান। বোগনভিলিয়ার মাটিও এটা। রুক্ষ নীরস। বোগনভিলিয়া ভারতে এত হয় যে এতদিনে ফুলটির একটি সুন্দর ভারতীয় নাম দেওয়া যেত। একটি অমলতাস গাছ থেকে লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে হনুমান।

দেখতে দেখতে পুরণ বলে, অশরীরী কোনো আতঙ্কের কথা সুরজপ্রতাপ লিখেছে?

—হরিশরণজী ব্লক থেকে জীপ পাঠাবে?

—কী লিখেছিল সুরজপ্রতাপ?

—গল্প কথা।

—গল্প কথা সেটা?

—কেমন করে আপনাকে বোঝাই? বছর বছর অনাহার। ওদের শিশু জন্ম কমে যাচ্ছে, সরকার এখনো পিরথার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিল না। ওরা অনেক দিনই ধরে নিয়েছে যে সরকার ওদের ত্যাগ করেছে। এখন ওরা দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবে নিজেদের কী বোঝাবে? ঘটনা যাই হোক, নিজের শান্তির জন্যেও তার একটা ব্যাখ্যা তো চাই। তাই গল্প কথা ছড়াচ্ছে।

—গল্প কথাই শুনি।

—আপনি মধ্যভারত এসেছেন, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জব্বলপুর, ধারা-মাণ্ডু, ভূপাল, দেখে যান না। জানেন, এখনো শিবপুরীতে উৎসব হয়, মূর্তি-উৎসব। রাজাদের মূর্তিকে সেবা করে প্রাচীন রাজাদের সেবক বংশ! 'মধ্য ভারতের মধ্য যুগ', ভালো লেখা হবে। রাস্তায় যান, আদিবাসী দেখুন।

—কী ব্যাপার বলুন তো? আপনিও বিশ্বাস করে বসে আছেন যে আতঙ্কের কোনো ব্যাপার ঘটেছে?

—এই ছবিটা দেখুন।

—কোনো গুহা চিত্র?

—একটা ছেলে এঁকেছিল তার ঘরের পাথরের দেয়ালে। ফোটোটা সুরজপ্রতাপের তোলা, কিন্তু না, এ ছবি কোনো কাগজে দেবার নয়, নট ফর পাবলিসিটি।

—ও তো লেখার সঙ্গে ও ছবি ছাপেনি।

—না, নেগেটিভ তো আমরা নিয়ে নিলাম। ও এটা ছাপতে পারবে না, ওর হাতে নেই।

কী এটা? পাখি? বাদুড়ের মতো জোড়া ডানা, এবং অতিকায় গোসাপের মতো শরীর। এবং চারটে পা? হাঁ করা বীভৎস মুখে দাঁত নেই।

—এ তো···

—বলবেন না। শুনব না।

—এটা ও আঁকল কী করে?

—জানি না। ছেলেটা বোবা মেরে আছে।

—কোথায়। কোথায় আছে ওর আঁকা ছবি?

—পিরথায়।

এস ডি ও. এখন ঝলকে ঝলকে কথা বলতে থাকেন। যেন জোর জখম কোনো মানুষ মরার আগে সর্ব চেষ্টায় হাসপাতাল বা পুলিশ বা ঘাতকদের বা বন্ধুজনের কাছে জবানবন্দী দিচ্ছে।

চিতোরার সেই লোকটির মতো। পুরণ যেখানে ছিল উপস্থিত। দীর্ঘ বিতর্কিত ভূখণ্ডের দখল নেবে পাসিরা, এবং নিতে দেবে না, দেবে না, ব্রহ্মর্ষি সেনাদল। এখন অবশ্য জমি পাসিদের দখলে, এই মুহূর্তে, তবে আবার মালিকানা বদল হতে

পারে। পুরণের রাজ্যে জমি বড় জাত বদলায়। পুরণরা হাসপাতালে যায়। লোকটি ঝলকে ঝলকে বলছিল, আগে ছিল রামনাগিনা, আর লাখন, আর নাথনিরাম, আর অনেক লোক · পাঁচটা বন্দুক·· রামনাগিনা গুলি চালিয়ে দিল···আমি দৌড়চ্ছিলাম পুলিশ ডাকতে···পুলিশ ডাকতে···ওটা মণ্ডল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র-অসপাতাল বলেই পত্রকাররা গিয়ে জুটতে পেরেছিল এবং সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের আদিত্য নওলাক্ষা থাকার ফলে সুবিধে হয়।

এস. ডি. ও. সেই লোকটির মতো করে কথা বলছেন। হাত নাড়ছেন, বোঝাতে চেষ্টা করছেন, যেন পুরণের সঙ্গে ওঁর ভীষণ-রকম কম্যুনিকেশন গ্যাপ বা যোগাযোগ (মানসিক, ভাষাগত), বিচ্ছেদ। দুজনে কি দুই দ্বীপে অবস্থিত এবং এ-ওর ভীষণ জরুরি বক্তব্য বুঝছে না, সাগরবেলায় দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কথা বলে যাচ্ছে? এখন তো এই সমান্তরাল ব্যবধান সংক্রামক। মাহুন্দীতে একটা লোক, তার মোষকে বিষ দিয়ে মেরেছিল বলে দোষীর মাথা ফাঁক করে দেয় ও পুলিপোলাও হয়ে যায়। একটা মোষ কত দামী যে সেজন্যে বিশ বছরের জন্যে জেলে যাচ্ছ? এ প্রশ্নে লোকটি কণ্ঠার হাড় নাচিয়ে মুখে ফেনা তুলে পুরণকে, গ্রাম-জীবনে মোষ কী ব্যাপার, তা বোঝাতে চেষ্টা পায়। একটি মহিষ এক সচ্ছল গ্রামীণ কৃষকের কাছে অমূল্য সম্পদ।

ওর উদ্বিগ্ন ও জরুরি সংবাদের পিছনের ব্যাকুলতা পুরণ বোঝেনি। যদিও সে লোকটির কথা খুব মন দিয়ে শোনে ও মর্মগ্রাহী করে ছোট সংবাদ করে দেয়, 'একটি মোষের জন্য।'

এস. ডি. ও. বলে যান সংবাদটি।

—শুক্লপক্ষ ছিল। জ্যোৎস্না রাত ছিল। সেদিন পূর্ণিমাও হতে পারে, জানি না। মাধোপুরা অবধি এসেছিল সরপঞ্চ, সঙ্গে পিরথার কিছু লোক ছিল। শঙ্করও ছিল। আপনি শঙ্করকে পেয়ে যাবেন। গ্রামে ও একমাত্র লোক, যে সাক্ষর। টাউনে ওই

মাঝে মাঝে আসে। আদমসুমারির সময়ে। রাস্তার কাজ করবার সময়ে লোক জোগাড় করতে ওকে মাঝে মাঝে কাজে লাগায় আপনার বন্ধু। হরিশরণজী ওদের আপনজন!

'আপনজন' শব্দ দুটি উচ্চারণ কালে যথেষ্ট অবহেলা প্রকাশ পায় না।

—তারপর কি প্রাণীটাকে দেখল?

—না।

এস ডি. ও-র গলা অন্যরকম হয়ে যায়। পুরণের কণ্ঠস্বরের লঘু চাপল্যকে তিরস্কার করে।

—ওরা কয়েকজন ফিরছিল। গ্রামে খুব ঢোল বাজছিল। বিশেষ খবর জানাতে ওরা পাঁচটা কাঠি মেরে ঢোল বাজায়। এ শব্দটা সে রকম। তাহলে কোনো কিছু ঘটেছে বলে ওরা জোর পা চালায়। চাঁদনী রাত ছিল। জ্যোৎস্না রাতে আপনি ওখানে গাছের পাতা গুনে নিতে পারবেন। ওরা, পিরথা নালা যেখানে কিছু চওড়া সেখানে বালি ও পাথর ধরে হাঁটছিল। এ সময়ে ওরা একটা অদ্ভুত ছায়াকে উড়ে যেতে দেখে। খুব বড় নয়, খুব ছোট নয়, এক পাখি।

—ওরা 'পাখি' বলেছে?

—প্রথম দিন তো তাই বলেছে। উড়ে যেতে দেখলে পাখিই তো ভাববে। আর কী ভাববে?

—কোনো বড় জাতের বাদুড়?

—ওখানে বাদুড় নেই। উড়ছিল যেন ভেসে ভেসে। ঢেউয়ের মতো ভাসছিল, দুলে খানিক নামছিল, আবার একটু উঠছিল। ওরা মুখ তুলে দেখে খুব ভয় পায়। খুব ভয়…ছায়াটা ওদের সঙ্গে চলছিল।

—কতক্ষণ?

—জানি না। আপনি বলুন না আপনার কাগজের মালিককে,

ওদের সকলকে এইচ. এম. টি. ঘড়ি কিনে দিতে। রেডিয়াম ডায়াল থাকবে। আর প্রশিক্ষণ দিন। আশ্চর্য কিছু দেখলেই ওরা যাতে সময় দেখতে পারে।

—ক্ষমা চাইছি।

—এটা ক্ষমা চাওয়া, ক্ষমা করার ব্যাপার নয়। হিসাবের বাইরের ব্যাপার।·· ছায়াটা চলতে চলতে পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে যায়। ওরা গ্রামে পৌঁছে দেখেছিল পিরথার সমস্ত লোক পথে। আর গ্রামপ্রধান ঢোল বাজাচ্ছে। এরা পৌঁছাতে গ্রামপ্রধান বলে, আমাদের উপর দিয়ে একটা অশুভ ছায়া চলে গেছে, আমাদের বিপদ আসছে।

—এটাই সেই অশরীরী আতঙ্ক? এ তো শরীরী কোনো প্রাণী, যে ডানা নেড়ে উড়তে পারে!

—পিরথা যান। সে কথা ওদের বোঝান। আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। পিরথার ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না। দুর্ভিক্ষ এলাকা বলা হয় না। পিরথায় চিরকাল আকাল। ওদের কোনো সাহারা নেই, হবে না। কয়েক হাজার মানুষ এখন হতাশা মেনে নিয়েছে। চাইতে জানে না, চায় না, দিলে নেয়। কী করে বোঝাব, ওই আদিবাসীরা যুক্তি দিয়ে ভাববে, ব্যাখ্যা করবে, এটা সম্ভব নয়। শহরের মানসিকতা নিয়ে ওদের বুঝবেন? একটা স্কেল দিয়ে ভারত মহাসাগর কত গভীর, তা মাপবেন?

—আপনি তো দরদী অফিসার···

—দয়া করে এটি আপনার কাগজে লিখবেন না। 'দরদী' লিখলেই বদলি। আর ও কথাটা তো মিথ্যে।

এস. ডি. ও. ম্লান হাসেন, অন্যমনস্ক হয়ে যান, অথবা নিজের মনের অতলে ডুবে যান।

—দরদী হলে তো কাজ করতাম। 'দরদী' হবার কোন দরকারও করে না। যেটুকু করার কথা সেটুকু করলেই অনেক

কাজ হয়। কুয়া কাটাব, বাধা আসে। রাস্তাটা বাড়াব···ঠিকাদাররা আর রাজনীতিকরা আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী···তবে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র আমি করে ফেলব। আর ইলাকায় চারটা কুয়া, আর পিরথা নালা পাহাড় থেকে যেখানে পড়ে, সেখানে বাঁধ···এসব লিখবেন না। বরঞ্চ উপকার হবে, অফিসার কত অকর্মা, হৃদয়হীন লিখলে। যদি অ্যাসেম্বলিতে কথাটা ওঠে, 'কেন কাজ করছ না' হুমকি আসে, তাহলে হয়তো···কিন্তু পিরথাতে তো ছায়াটা কয়েকদিন দেখা গেল।

—বলেন কী?

—যত দেখা গেল, তত আতঙ্ক ছড়াতে থাকল।···কত রকম গল্প! আমি তো সুরজপ্রতাপের ছবি দেখে ফিলম রোল নিয়ে নিলাম।

—ছাপতে দিতে পারতেন।

—না· অসম্ভব। তাহলে তো প্রাণীটা যে কী, তাও মেনে নিতে হয়। তা কেমন করে সম্ভব?

—আপনি গিয়েছেন একবারও?

—কয়েকবার গেলাম। না আর কোনো ছায়া দেখা যাচ্ছে না। আর তো দরকারও নেই। ছায়া ওদের মনে ছাপ মেরে বসে গেছে। সে তার কাজ সেরে চলে গেছে।

—আপনি কী শুনলেন?

—আপনি গিয়ে শুনুন। আমার শোনা আপনি মেনে নেবেন কেন? কী দেখলাম, তা শুনুন।

—কী দেখলেন?

—জঙ্গল পাহাড়, গুহা, সব ঘুরে দেখেছি। কিছুই পাইনি। ছেলেটার হাতে আঁকা ছবি দেখেছি।

—সেটা আছে?

—আছে। এখন ও ছবি মুছে ফেলা যাবে না। পাথরে খোদাই

ছবি। তাতে পুজোআজা হচ্ছে। না, আপনার জীপ এল না, আজ তো আপনাকে এখানে থাকতে হয়। বাংলা কি খালি আছে…কোন ডিপার্টমেণ্টের তাও জানি না।

— হোটেল নেই ?

—সে সব হোটেলে আপনার সুবিধে হবে না। আপনার অসুবিধা না হলে আমার বাংলায় থেকে যান। কাল আমাদের ট্রাক ব্লকে যাবে, চলে যাবেন।

—আমার কোনো অসুবিধে নেই।

—জানি। পত্রকাররা সব পারে।

—হরিশরণ এটা কী করল ? ও তো জানে আমি আসব।

—হয়তো বেরিয়ে গেছেন।…আপনার বন্ধু ? দেখলে আপনার চেয়ে কমবয়সী মনে হয়।

—সহপাঠী। ভালো ছাত্র ছিল। ওর বাবা পাটনা থেকে জব্বলপুরে বদলি হলেন, রেলে ছিলেন, ওরা চলে এল। ও মাঝে মাঝে যেত বলে যোগাযোগ আছে। আমরা কখনো ভাবিনি ও মধ্যপ্রদেশ সিভিল সার্ভিসে ঢুকবে।

—কেন। কী ভেবেছিলেন ?

—ও বলত অধ্যাপক হবে।

—আমি ভেবেছিলাম জিওলজিস্ট হব। আমার ভাই ভেবেছিল ডাক্তার হবে, এখন 'পিজিয়ে' কোলা ড্রিংক বেচছে। চলুন… পিরথার আতঙ্কের কথা এত ছড়িয়েছে, যে মাধোপুরাতেও চলছে বিপদনাশনে পুজোআজা। পিরথা ব্লক, কিন্তু আপিস তো রাজোরায়। সেখানেও মানুষ কত কী দেখছে! মন্দিরে পুজো দিচ্ছে।

মাধোপুরা নতুন জেলা। এই সদর শহরও খুব বড় নয়। নতুন পথ ঘাট। নতুন বাড়ি।

—ছোট শহর…একটা মন্দির আছে…এটা নতুন হাসপাতাল ··

ওটা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি এই যে আমার বাড়ি। কষ্ট কিছু হবে। আমার স্ত্রী দিল্লি গেছেন ··আমিই সাহস পেলাম না। প্রথম বাচ্চাটি তো এখানকার ডাক্তারদের ভুলে জন্মাবার অল্প আগেই··· এবার শ্বশুরবাড়ি পাঠালাম···বাবা ডাক্তার ওর···আমি সেবারও ওকে পাঠাতে চেয়েছিলাম, ও বলল, তা হতে পারে না। নতুন হাসপাতাল, ডাক্তার আছে, সব আছে···না শুনলে ভালো হত। মেয়েটা ··সীজারিয়ান করলে বেঁচে থাকত···ভুল তো হয়ে যায়।

গৃহিণী না থাকার চেহারা ঘরে দোরে। বাড়িতে স্ত্রীলোক আছে কি নেই, বাড়িই তা বলে দেয়।

—এই ঘরে থাকুন। বাথরুম সঙ্গেই। পিথোরা যাবেন, সম্ভব হলে গুহাটা দেখবেন। গুহার দেওয়ালে ছবিও পাওয়া গেছে কিছু।

—গুহামানবদের আঁকা?

এস. ডি. ও. নিশ্বাস ফেলে।

—ওহি তো খচড়াই। আমার বিশ্বাস ওদের কেউ আঁকে। আমি তো পাঁচ বছর আগে এ ছবি দেখিনি। অবশ্য ছবি খুঁজতেও যাইনি। আর, মাতাল, ওই ঢোল বা মাদলের মতো বাজনা বাজিয়ে যৌথনৃত্য, তাই বা গুহামানবদের আঁকা···বহোৎ কঠিন কাজ পূরণজী! ঘুড়ির সুতা ছেড়ে কি সূর্য কতদূরে তা মাপা যায়? পাখিরাই তা জানে না।

—পাখি আর কত জানতে পারে?

—'বার্ডস' দেখুন। আসামে জাটিংগায় পাখিদের দলে দলে আত্মহত্যা দেখুন। পাখিরা কী জানে আর কী জানে না, আমরা কেমন করে বলব! আমাদের সঙ্গে পাখিদের কোনো কম্যুনিকেশন নেই। প্রকৃতির ব্যাপারে আমরা সব জানতে পারব না।

এস· ডি· ও···র ঘরে অনেক বই। মূলত ভূতত্ত্বের। কিছু

ইংরিজি ও হিন্দি উপন্যাস। কিছু ভেরিয়ার এল্যুইন। এবং দাবা বিষয়ে বই সব চেয়ে বেশি, নানামুখী আগ্রহ!

—দাবা চলে?

—না।

—না!

—এখানে কাউকে পাই না।

স্নানের পর ওরা খেতে বসে। স্টেনলেস স্টিলের ডাব্বা খুলে খেতে হয়।

—খাবার তৈরী করে রেখে যায় ওরা। আচার নিন। খেয়েদেয়ে শুয়ে যান। ট্রাক তো ভোরে আসবে।

—প্যাসেঞ্জারের ট্রাক?

—না।

এস. ডি. ও. সামান্য হাসে।

—হরিশরণজীর ট্রাক। আমাকে জানিয়েছে, খাবার, দুধের গুঁড়ো, ডাক্তার, ওষুধপত্র, দেশলাই, কিছু কাপড় পাঠাতে। আমি পাঠাচ্ছি, চাল, মকাইয়ের খই, ভুরা গুড়, সামান্য দুধের গুঁড়ো আর অনেক চেষ্টায় ডাক্তাররা কিছু নমুনা ওষুধ দিল। জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড় বড় পোস্টার, ওগুলো মেঝেতে পেতে নেবে, দেয়ালের ফাটল সারবে কুঁচের আঠা মেরে, হরিশরণজী জানে।

—আপনি যাবেন না?

—ওখানে তো আকাল নেই। তবে যাব একবার। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর কী ভাবে পালন করা হবে সে বিষয়ে মাইকে বক্তৃতা দেব। ভাই আর বোন! স্বাধীনতা দিবস পবিত্র দিবস। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সবাই যে যার ঘরে পতাকা তুলবেন, খুশি মনাবেন, ধুম মচাবেন, ঘর ঘর দীপ জ্বালাবেন, আর রাজৌরাতে মিটিঙে অবশ্য যাবেন। মায়লে, বি. ডি. ও. থানা সার্কল অফিসার, সরপঞ্চরা বক্তৃতা দেবেন।

আদিবাসী নাচ-গানের দল আনবেন।

—তাও হবে?

—আদিবাসী প্রধান জেলা, ব্লকও তাই, আদিবাসী নাচ-গান হবে না তা কি হয়?

—কারা নাচবে?

—সরকার চাইলে সব পারে। আচ্ছা!

ওরা উঠে পড়ে। তারপর হাত-মুখ ধোয়া, বিছানায় গড়িয়ে পড়া। এবার ঘুমিয়ে পড়বে পূরণ।

ঘুমের মধ্যে গুহাচিত্রের নরনারী নাচে। ঘুমের মধ্যে একটা ছায়া ভেসে ভেসে ওড়ে। না, ব্যাপারটা এলাম, দেখলাম, রিপোর্ট লেখার জন্যে নোট নিলাম, কিছু ছবি তুললাম, টেপে ধরলাম কিছু কণ্ঠস্বর, ঠিক সে রকম নয়। কিছুদিন থেকে গেলেই বা কি? সম্ভব হলে সরস্বতীকে চিঠি লিখতে হবে, বত্রিশটা কোনো বয়স নয়। তবু স্বপ্নে, গুহাচিত্রের নরনারীরা নাচতে থাকে এবং পূরণ সরস্বতীকে যেন শুধায়, নাচবে না কি?

এ সময়েই গায়ে ঠেলা দেয় কেউ।

—উঠুন, উঠুন, ট্রাক এসে গেছে।

—ইশ্! দেরি হয়ে গেল।

—চা নাস্তা তৈরি।

ঝটপট ব্যাগ গোছানো। এতকাল ধরে ব্যাগ গোছাচ্ছে আর কাঁধে বইছে পূরণ, যে ব্যাপারটা যান্ত্রিক হয়ে গেছে। লুঙ্গি, গামছা, জীনের প্যান্ট ও পাঞ্জাবি (এটা জাতীয় পোশাক হয়ে যাচ্ছে, এখানে জীনের প্যান্ট ও পাঞ্জাবির চক্ষে 'পুরুষ ও নারী কোনো ভেদাভেদ নাই'), মাংকি ব্রান্ড দাঁতের গুঁড়ো (টুথব্রাশ ওর চলে না), সাবান, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, চিরুনি, ক্যামেরা, ছোট টেপরেকর্ডার, খাতা, তিনটি বল পয়েন্ট। ব্যাগটা ভাল। পাটনায় পূরণ কিনিয়ে নিয়েছিল!

চা, পাঁউরুটি, মধু কলা।

—খেয়ে নিন। সামনে সফর।

—আপনি গুহাচিত্রের ছবি তোলেননি?

—তুলেছি। আপনিও তুলবেন।

—ওই প্রাণীটার ছবি?

—না ওটা আমি বিশ্বাস করব না। আমাকে আজকের বাস্তবতা নিয়ে বাঁচতে হবে। আসুন। ফেরার সময়ে আপনার অভিজ্ঞতা জানিয়ে যাবেন। পিরথা কহানী পড়ব।

—নিশ্চয় বলে যাব।

—নমস্কার।

ট্রাকে উঠে বসে পূরণ। একটি রোগা পাকানো চেহারার লোক ড্রাইভারকে বলে, ট্রাক থামাবে না।

স্বাস্থ্যবান ড্রাইভার দু-পাশের ছুটন্ত জনপদ, মানুষজন ও গাছপালাকে বলতে থাকে, ও আদিবাসী লোককে চাল দিয়ে কী হবে? চাল ওরা কবে খায়? এত ভাল গুড়, মকাইয়ের খই! সরকার তো আছে আদিবাসীর জন্যে।

রোগা লোকটি কথা বলে না।

—চাকরি বলো, কোনো সাহারা বলো, সব জায়গায় আদিবাসী আর তফসিলী!

পূরণ বলে, ওদের কোনো অভাব নেই?

—ওদের অভাব কেউ ঘুচাতে পারবে না সার। ওরা যা পাবে, সব বেচেও দেয়, খন্দের তো রাজোরাতে মৌজুদ আছে না? ঘর করে দিলেও থাকবে না, কেন সরকার ঘর করবে তাই বলুন?

পূরণ ব্যাগ থেকে বই বের করে, আবার ঢোকায়। বই তো ও পড়েই এসেছে। এখন দু-পাশে দেখছে গ্রাম।

মধ্যপ্রদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। প্রায় আশি ভাগ মানুষ বাস করে গ্রামে। পিরথা ব্লকের মতো গ্রাম নিশ্চয় নয়।

একাশি সালের হিসাবে মধ্যপ্রদেশে এক কোটি উনিশ লক্ষ সাতাশি হাজার একত্রিশ তফসিলী আদিবাসীর বাস। মোট জনসংখ্যার বাইশ পয়েন্ট সাতানব্বই অনুপাত। ছেচল্লিশ গোষ্ঠীর আদিবাসী, তাদের উপগোষ্ঠীর ভাগ আবার একশো সাতচল্লিশ।

ভূসীমা চার লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশো ছেচল্লিশ বর্গ কিলোমিটার। তার মধ্যে তেতাল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ ভাগ জমি কর্ষণযোগ্য। গুহাচিত্রগুলি কে এঁকেছে খোদাই করে? আজকের মানুষের ছবি? আদিম গুহা চিত্র না হলে তো কোনো বিক্রয় বা বিজ্ঞাপন বা দূরদর্শন মূল্য নেই। মধ্যপ্রদেশে চৌদ্দ পয়েন্ট চার ভাগ জমি সেচ পায়। মালব অঞ্চলে উর্বর কালো তুলো চাষের জমি, কার দখলে? প্রধান খাদ্যশস্য জওয়ার, গম ও চাল। কারা খায়? কোদো, কুটকি, সোমা, এ সব নিকৃষ্ট শস্যও জন্মায়। এ রাজ্যের বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য তৈলবীজ, তুলা ও আখ। এক ভীল তার পরিবারের ছয়জন সহ দারিদ্র্যের কারণে সেদিন আত্মহত্যা করেছে, যদিও আদিবাসীদের অলিখিত অভিধানে আত্মহত্যা নিদারুণ পাপ। মধ্যভারত সয়াবিন চাষে শীঘ্রই সাড়া জাগাবে। সবুজ বিপ্লবের পরই কি সয়াবিন বিপ্লব? এই সয়াবিনের পাউডার, নিউট্রি নাগেট, তেল, গোটা দানা কারা খাবে?

খনিজ লোহা, ম্যাংগানিজ, কয়লা, চুনাপাথর, টিন আকরে মধ্যপ্রদেশের মাটি রাজা। গড়ে উঠেছে বড়-মেজ-সেজ-ছোট শিল্প। কৃষি-ভিত্তিক শিল্পও গড়ে উঠেছে, উঠছে। ছেলেটা ও ছবি আঁকল কী দেখে? বিদিশা, উজ্জয়িনী, "বিদিশা কে কান্তা" কার লেখা উপন্যাস পড়ল সেদিন? আবুঝমাড়ে আছে এক সুবিশাল কুয়ার মতো জায়গা, অথবা দৈত্যাকার গামলার মতো। তার পেটে, কোনোদিন সূর্যের আলো সম্পূর্ণ পড়ে না। সেই আদিম গোধূলির দেশে বাস করে আদিবাসীরা। কবে যেন ওরা আক্রান্ত

হয়ে প্রাণ বাঁচাতে পৃথিবীর পেটে ঢুকে গিয়েছিল, এখনো সেখানেই থাকে। ওরা ছাগল পালে, বেচে।

কত ফুট যেন পাথর বেয়ে নামলে ওদের ওখানে পেঁছনো যায়। আধা অন্ধকারের সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওদের চোখ। ছাগল নিয়ে পাথর বেয়ে ওরা উঠে আসে, চরায়, আবার পাথর বেয়ে নেমে যায়। ওরা কি বাইগা আদিবাসী? উপরের জগতের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক হাটে যাওয়া, ছাগল ও ছাগলের দুধের তীব্রগন্ধী দই ও ঘি বেচা, খাদ্যশস্য-তেল-লবণ-কাপড় কেনা। উপরে উঠে এলে ওরা দেখতে পায় চওড়া, উদ্ধত সব পথ। আদিবাসী কল্যাণের যত টাকা সব দিয়ে এসব পথ তৈরি হয়েছে যাতে মালিক, মহাজন, আড়কাঠি, দালাল, আদিবাসীর তৈরি মদ ও আদিবাসী রমণী-ইচ্ছুক লাফাঙ্গা মদগর্বিত যুবকরা সিধা ঢুকে যেতে পারে আদিবাসী জনপদে।

যে পূরণকে কাহিনীটি বলে, সে এবং তাদের সংগঠন ভূপাল গ্যাস নিয়ে ছবি করে, এবং আক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে, এবং মধ্যপ্রদেশ প্রশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে অবশেষে বিহার চলে এসেছিল।

বিহার প্রশাসনও ভাগলপুর জেলে বন্দীদের অন্ধ করার তথ্যচিত্রর ব্যাপারে খুশি ছিল না।

সে বলেছিল, ওই আদিবাসীরা যখন ওই পথ দিয়ে হাটে যায়, ওরা যায় ওদের শিক্ষাব্যবস্থা, সেচের জল, পানীয় জল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এ সবের সমাধির ওপর দিয়ে।

শুধু ওরা তা জানে না।

কী ওদের প্রাপ্য? ভারতের জনসংখ্যার সাত পয়েন্ট ছিয়াত্তর ভাগ যারা, সেই পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ আটাশ হাজার ছ-শো আটত্রিশ জন মানুষের? এখনো তা ওদের জানানো হয়নি। যদিও দিল্লি ও রাজ্যগুলি প্রত্যহ কোটি কোটি টন কাগজে নানা

প্রসঙ্গ ছেপে চলে। রেডিও ওদের জানায় না, দূরদর্শন জানায় না, সংবাদপত্র জানায় না, মায়লে এবং এম. পি. হোনেবালা জানায় না, পঞ্চ বা পঞ্চায়েত জানায় না, রাজ্য সরকার জানায় না, আদিবাসী মন্ত্রক জানায় না।

কী বিপুল শ্রম অর্থ ব্যয় চলে এই না-জানাবার নীতি অনুসরণ করার জন্য। কত কৌশলী মাথা খাটে। কত রাজনীতিক প্যাঁচ চলে।

কী তার প্রাপ্য ছিল! আদিবাসী সেটা না জেনেই তার ছায়াবৃত অবস্থান নিয়ে একুশ শতকে ঢুকে যাবে।

পূরণ শুনেছে, একবার নাকি জওহরলাল নেহরু, একবার না কি ইন্দিরা গান্ধী, আবুঝমাড়ে ওই অতলে নামবার চেষ্টা করেন, পারেননি।

আর কেউ চেষ্টাই করেননি।

ওদের কাছে পেঁছিবার পথ এত দুর্গম

রাজোরা এসে যায়।

খুব ছোট জায়গা। ব্লক আপিস। থানা, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বন্ধ)।

ব্যাঙ্ক, ডাকঘর ছাড়া পাকা বাড়ি নেই বলতে গেলে। বাজার দোকান আছে, আর আছে কাঠ চেরাই কল। দুটি ভি. ডি. ও হল, একটি সাইনবোর্ড বলছে এটা 'পশু চিকিৎসা কেন্দ্র', কিন্তু পিছনে দেখা যায় ছাতবিহীন এক ঘর, যার দরজা জানলা হয় লোপাট, নয় কোনোদিন ছিল না।

ব্লক আপিসের সঙ্গেই আবাসন। হরিশরণ বেরিয়ে আসে এবং অত্যন্ত আনন্দে বলে, ইউ বাস্টার্ড। দাঁড়াও মালগুলো গুনে নিই। রাজোরার মুকুটহীন রাজার সঙ্গে আমার লড়াই চলছে কাল থেকে।

—কেন?

—কোদো বলো, কুটকি বলো, কুঁচ তেল বলো, সব তো ও কিনে নেয় কম দামে, ওদেরকেই বেচে বেশি দামে। এবার বলছে, চাল দিয়ে দিন আমাকে, আমি মকাই দিয়ে দেব তার বদলে, কিছু টাকাও নিয়ে নিন, বোঝো।

—তোমাকে বিপদে ফেলবে না তো?

—অবশ্যই ফেলবে।

হরিশরণ মহানন্দে হাসে।

—জেলা থেকে দিকে দিকে লেবার চালান দেয়। মস্ত লেবার কণ্ট্রাকটার। ওর ক্ষমতা কি কম?

—মস্তান দিয়ে নামিয়ে নেবে না তো?

—না, অতটা করবে না। আর এখন তো এখানেও আতঙ্ক। পিরথা থেকে অভিশাপটা এদিকেই আসছে বলে জোর গুজব। খুব পুজোতাজা চলছে।

—পিরথার লোকরা কী বলছে?

—ওরাই বলবে। পিরথার লোক আছেও এখানে। শংকর! এদিকে এসো।

কালো, রোগা, মাঝারি চেহারার যুবক। কোঁকড়া চুল তেল বিহনে কটাসে, চোখ খুব পর্দা ঢাকা, পরনে খাটো ধুতি।

—ইনিই আমার বন্ধু, পত্রকার।

শঙ্কর তাকিয়ে থাকে।

—পিরথা যাবেন, হয়তো দু-একদিন থাকবেন।

—এখন!

—হ্যাঁ।

শঙ্কর এ সময় হাত জোড় করে বিড়বিড় করে কী বলতে থাকে, এবং পূরণ হঠাৎ বোঝে, ওর চোখ ওর মনের প্রতিচ্ছবি। ও চায় না যে পূরণ ওখানে যায়। শংকরের ঠোঁট নড়ে কিছুক্ষণ, নিশ্চল হয়।

গলায় কালো সুতো এবং একটি ছোট তামার পদক।

হরিশরণ বলে, ঠিক আছে শংকর। ইনি আমার লোক।

—কেন যাবে?

—বললাম তো, আমার লোক।

শংকর চুপ করে যায় এবং ধীরে এসে ওঠে ট্রাকে। ও বস্তা-গুলির ওপরেই বসে, অন্যমনস্কভাবে বিড়ি ধরায়।

হরিশরণ বলে, ঘরে বসবে? না আমরা যাব?

—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তো আলাপই হয়নি।

—তিনি কি এখানে থাকেন না কি? নিজেও এম. পি. সি. এস। ইন্দোরে কাজ করেন। দুই কন্যা সেখানে পড়ছে। আমরা মাঝে মাঝে একসঙ্গে মিলিত হই এখানে অথবা ইন্দোরে অথবা জব্বলপুরে। মা আছেন সেখানে।

—তোমায় অসুবিধে হয় না?

হরিশরণ বলে, না না, আরে ও তো ঘর গেরস্তির কিছুই জানত না। আমিই শিখালাম। তা ছাড়া লেখাপড়া শিখেছে। কাজ করে, 'না' বলব কেমন করে? আর কি জান, ওর অনেক উচ্চাশা। মেয়েদের শিক্ষা দেব, দহেজ দেব না। শেষ অবধি জব্বলপুরে থাকব, স্কুল করব। আমার তো কোনো উচ্চাশা নেই। ভেব না, ফেরার পর এখানে থেকে যেও দু-একদিন। পিরথাতে থাকবে, না চলে আসবে?

—কয়েক দিন থাকব।

—ভাল। আমি তোমাকে একটা প্যাকেট দিলাম। পরে হয়তো কাজে লাগবে।

—কি, বই?

—ওখানে গিয়ে দেখো। দাঁড়াও তোমার লন্ঠন লাগবে, কেরোসিন তেল, একটা মশারি…

—মশা আছে?

—না, সাপ।

—ওরা তো থাকে।

—ওরা থাকে, অন্য কোনোভাবে থাকার ব্যবস্থা নেই বলে। তুমি তো ওদের মধ্যে পড়ো না।

—সুরজপ্রতাপ এ সব নিয়েছিল ?

—না। ও অন্য ধাতের ছেলে।

—ও কোথায় ?

—ওই জানে। পিরথা রিপোর্ট লেখার পরই চাকরি গেল। মায়লের শালার কাগজ বলে কথা! আর···পিরথা থেকে এসে তো ওর ব্রেন ফিভার মতো হয়ে যায়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই ডুব মেরেছে।

—গেল কোথায় ?

—আমি ওকে যতদূর জানি, আবার ও ফিরে আসবে। সুরজ কয়েক বছর বাদে বাদেই ঘুরে ঘুরে আসে।

—খুব ক্ষমতা ছিল।

—ছিল, আছে। কিন্তু স্রোতের সঙ্গে চলতে শেখেনি, যেটা দরকার। তুই যদি টিকে না থাকিস···সিস্টেমকে ব্যবহার করে তার মুখোশ খোলো। ও শুরু করছে সেই প্রেমিস থেকে, যে যেহেতু স্বাধীনতাই মিথ্যা, উত্তর-স্বাধীনতা ভারতীয় গণতন্ত্রের সবই মিথ্যা,—এ রকম চিন্তাধারা অবশ্যই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ওর কোথাও টিকে থাকার পক্ষে মুশকিল।

—হ্যাঁ···বন্দোবস্তীর প্যাটার্নে পড়ে না।

—পিরথা প্রসঙ্গে ও পাঁচ সাত হাজার বছর আগে ভারতে জনজাতির ইতিহাসে ফিরতে চায়। আমার দরকার যেনতেন প্রকারেণ হাল্লা তুলে দিয়ে পিরথাকে মধ্যপ্রদেশের তথা ভারতবর্ষের মানচিত্রে আনা। কোনো স্বর্গ চাই না শুধু যেটুকু করা যায় প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে, যা আমরা হয় দরদের অভাবে,

নয়, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক চাপে করতে পারি না। সেটুকু যাতে করতে পারি তার সহায়তা চাই। ওকে বুঝাবে কে? ও আমাকে উলটে মূল সত্য বুঝায়। পুরা সিস্টেম বদল করো।

—বিরল এমন মানুষ।

—হ্যাঁ। কিন্তু বাস্তবতাকে অস্বীকার করা ঠিক নয়···মনে করি, ও আবার ঘুরে আসবে।

—খায় কী, থাকে কোথায়?

—ওখানেই গণ্ডগোল। শীলা···ওর বউ, সে তো 'কুষ্ঠ একটি সামাজিক ব্যাধি' এই চেতনা আনবার জন্যে মহারাষ্ট্রে কাজ করে যাচ্ছে একটা সেন্টারে। সাহসী মেয়ে। জেদ আছে, কর্মী মেয়ে। সুরজ সেখানেও যেতে পারে, মাঝে মাঝেই যায়।

—ওর বিয়ে হয়েছে তাই জানি না।

—কী আশ্চর্য! ওদের ছেলেই বড় হয়ে গেল, পনের বছর বয়স হল। দলিত আন্দোলন-কালে সুরজ ও শীলার আলাপ। তারপরেই বিয়ে। সুরজ তো দলিত সম্প্রদায়ের লোক, আর 'তোমরা অচ্ছুত, আমি নই' বই লিখে এক সময়ে খুব সাড়া জাগিয়েছিল।

—সে বই তো···

—শ্যাম দুসাদের লেখা, ওর আসল নাম।

—বিহারে বাড়ি?

—কোনোদিন ছিল, সব কথা ও বলে না।

—আর লেখেনি?

—না। সুরজপ্রতাপ কোনো কাজ দু-বার করে না। শীলা খুব ভাল মেয়ে, দু-বার তো দেখলাম। ছেলেকে মানুষ করছে, নিজে কাজ করছে, আর সুরজের জন্যে অপেক্ষাও করে চলেছে। তোমার ব্যাপার কী? এখনো সংশয়, না সাহস নেই? ভারতীয় মেয়েরা বদলাবে কবে? সরস্বতী, তোমার মতো

হতভাগার মুখ চেয়ে সেই বসেই আছে ?

—এবার সব ঠিক করে ফেলব। সংশয়, না কাপুরুষতা, কী যে ব্যাপার তা নিজেই জানি না।

—এত না জানা ভাল নয় পূরণ। জীবন সংক্ষিপ্ত, এবং কিছুই না জেনে শতাব্দীর শেষ দেখা ঠিক নয়। মানুষ কতদিন বাঁচে বলো ? খুব বেশি তো একশো, বা আরো কিছু। ওই যে রাজৌরা পাহাড়। ওটাই হয় তো…

—হরিশরণ ?

পূরণ মুখে হাসি টেনে রেখে বলে, পাথরের বয়স বোলো না ভাই। এখনো আমি সৃষ্টির অতীতের দিকে তাকাতে প্রস্তুত নই।

—হ্যাঁ ঠিক…।

এবার ও অন্য গলায় বলে, শংকর ভাল লোক। ওদের তো একটা ব্যাখ্যাও দরকার ছিল সেই প্রাণীটির, বা ছায়াটি বিষয়ে। ওরা খাদ্য, জল, পথও পাবে না। শিকার করতে পাবে না, নাচ গান সব মুছে যাবে। আবার অবিশ্বাস্য সেই ছায়াটির ব্যাখ্যাও করতে পারবে না, এত বঞ্চনা কি সয় ?

—ওরা কী বলছে ?

—ওরাই বলবে।

পিরথা কাছে আসছে। ট্রাক উঠছে পাহাড়ে। এটা ঘাটি পথ। এক সময়ে ঘাটির মুখ আটকে দিলে শত্রু এগোতে পারত না।

—এ তো পাহাড়।

—উঠব, নামব, ট্রাক থামবে, আমরা থামব, নামব। মাল নামাব। সরপঞ্চের গ্রাম থেকে বলদের গাড়িতে মাল যাবে পিরথা, ঢোলকি, এই শুরু হল খাজড়া গাছ। শোনো, তুমি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন। শুধু অনুরোধ, সুরজের মতো 'ছাপব' বলে খেপে যেও না! ম্যান! যদি হঠাৎ কোথাও দেখতে পাও

খাঁটি সোনার মন্দির, অথবা কথা-বলা বৃক্ষ. তুমি কি সে খবর ছাপিয়ে দেবে এবং লেলিয়ে দেবে আজকের মানুষ-মিডিয়া-বিদেশীদের ?

—প্রথমত দেখব না, দেখলে চেপে যাব।

—এই তো চাই। আমরা পিরথার জরিপ ম্যাপের যে জন্তুটা, তার লেজ ধরে ঢুকছি। সামনে সরপঞ্চের গ্রাম গাবহি।

ট্রাক থামে।

দূর থেকে কোনো বাজনার শব্দ আসে—মাদল জাতীয়, ডুবু-ডুবু-ডুবু-ডুবু।

হরিশরণ বলে, চলছে, চলবে।

—এই এমার্জেন্সি ড্রাম ?

—হ্যাঁ। জরুরি অবস্থা চলছে।

দুই

ভারতের অস্ট্রিকদের বৈশিষ্ট্য মাঝারি উচ্চতা, কালো (কোনো ক্ষেত্রে বেশি কালো) রং, লম্বাটে মাথা, ঈষৎ চ্যাপটা নাক, কিন্তু পরিষ্কার মুখ চোখ। আরো আগেকার নিগ্রয়েডদের সংমিশ্রণ হয়তো চামড়ার রং ও চ্যাপটা নাকের কারণ। তার আগেকার অস্ট্রিকরা কি তীক্ষ্ণ নাসা, গৌরবর্ণ ছিল ? অস্ট্রিক আদিবাসীরা ভারত ব্যেপে ছড়িয়ে পড়ে, চলে যায় পূর্বে বর্মা, মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে (সেদিন কি ওরা সূর্যের সন্ধানে পুব থেকে পুবে যাচ্ছিল ?), চলে যায়, চলে যায়, চলে যেতে থাকে, বসতি করে থেকে যেতে থাকে। 'দি অস্ট্রিকস ফর্ম দি বেডরক অফ দি পীপল', গেজেটিয়ার অফ ইনডিয়া বলছে। পাঁচবার চামড়ার বাদ্যযন্ত্রে ঘা দেওয়া মানে জরুরি কোনো খবর জানানো। খবর আসছে, ছড়াচ্ছে। সরপঞ্চ মাথা নাড়ে, মাথা নাড়ে। কী বলা যায় মহারাজ ? ভীষণ, অমোঘ কিছু ছায়া ফেলে বারবার

ঘুরে যায় যদি…মহাভারতের মুষল পর্বে কালপুরুষের ছায়া পড়াছিল বারবার…কৃষ্ণের রং কালো, রামও কালো। খুব কালো হলে 'কালো', অল্প কালো হলে 'শ্যাম' বর্ণ। অস্ট্রিকরা ভারতীয় সভ্যতার ভিত স্থাপন করে। তারা ধান চাষ করত, সবজি আবাদ করত, আখ থেকে বানাত শর্করা। ওদের ভাষার এক শাখা মোন-খমের, তা বেঁচে আছে খাসী, নিকোবরী ভাষায়। আবার মুণ্ডা শাখার কত ভাগ, যে ভাষা-গোষ্ঠীতে পড়ে অন্তত ষোলটি আদিবাসী জনজাতি। এই নাগেসিয়া আদিবাসীরাও তো তার মধ্যে। এরা কবে ধান চাষ করত, সবজি ফলাত, আখ থেকে বানাত শর্করা? যারা 'বেডরক অফ দি পীপ্‌ল'—এর বংশধর, যাদের পূর্ব পুরুষ ভারতীয় সভ্যতার ভিত স্থাপন করে, তারা কেন এমন বিপন্নতায় বাজিয়ে চলেছে সংকেত? পূরণ স্বরাজ্য বিহারে পালামৌয়ে দেখেছে পারহাইয়া আদিবাসীরা ব্রিটিশ কর্তৃক 'অপরাধ প্রবণ জাতি' বলে ঘোষিত। এবং তারা সব দাসমজুর। নাগেসিয়ারা পাহাড়ের ঢালে থাকে, অতীতের কোনো স্মৃতি তাদের তাড়না করে, পাহাড়ে থাকলে তারা দেখতে পাবে শত্রু আসছে, পালাবে। কিন্তু এখন চারদিকে আধুনিক ভারত ও মধ্যযুগীয় পালামৌ, এ শত্রু দামামা বাজিয়ে আসে না, ওদের আর জায়গা নেই পালাবার।

গাবহিতে বর্ণহিন্দু কিছু আছে। সরপঞ্চ ভানু সিং শাহের মাথায় পাগড়ি গায়ে বেনিয়ান। সে নিজের পরিচয় দিল, গোণ্ড রাজ্য শংকর সিং শাহ, যাঁকে মিউটিনির সময়ে ইংরেজরা কামানের মুখে উড়িয়ে দেয়, সে তাঁরই বংশধর। পূরণ বিশ্বাস না করে তো তার ঘরে গিয়ে সুমুদ্রিত বংশবৃক্ষ দেখতে পারে। এটা ঘোর অবিচার যে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদিবাসী নায়কের বংশধর বলে কোনো স্বীকৃতি দিল না।

—আদিবাসী বলেই এই অবিচার।

হরিশরণ ও পূরণ এ-ওর দিকে চাইল। সরপঞ্চ অবস্থাপন্ন ওরই মধ্যে। মাটির উঁচু দেয়াল ঘেরা দুর্গসদৃশ বাড়িতে মোষ, জনাই বা মকাই রাখার ঘর দেখা গেল। উঠানে খাটিয়া। সরপঞ্চের এক ছেলে বিজলী আপিসে পিওন এবং আরেক ছেলে পরীক্ষা দিয়ে ডাক ও তার বিভাগে কেরানি হয়েছে।

হরিশরণ বলল, আপনি তো বংশবৃক্ষ যেদিন ছাপালেন, আমি প্রুফ দেখে দিলাম।

—হাঁ হাঁ। কিন্তু ইতিহাসে তো নামটা আছে ওর। আমাকে গোয়ালিয়রে ভালেরাও বলেছিলেন। আমাদের কথা তো আমরাই জানি না।

পূরণ গলা খাঁকারি দেয়।

—এটা খুব সত্য কথা। আপনার সঙ্গে পরে আলোচনা করব। অনেক কথা বলা যাবে।

—আপনি কি গাবহিতে থাকবেন?

—পিরথায় থাকব।

সরপঞ্চ শংকরের দিকে তাকায়। শংকর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। আকাশের পটভূমিতে একটি দুর্বোধ্য, ভাবলেশহীন কালো মুখ। ওই মুখ কোনো উত্তর দেবে না। ও কান পেতে শুনছে, চিন্তাকুল, চিন্তাকুল।

পূরণ বলে, ওরা কী বাজাচ্ছে?

—ঢোমরা বাজাচ্ছে।

—পাঁচ বার···পাঁচ বার···

—অমনি করেই আদিবাসীরা···আমরা···খবর জানিয়ে দিই।

সরপঞ্চের যদিও দীর্ঘকাল শ্রেণীবদল ঘটেছে (আদিবাসী সামান্য শিক্ষা পেয়ে সামান্য নিরাপত্তা পেয়ে যখন স্বশ্রেণী থেকে সরে যায়, তার উন্নতি হয়, না অবনতি? তাকে কি নিম্ন মধ্যবিত্ত, বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী সদস্যের স্বীকৃতি দেয়? পাকাবাড়ি-

মোটরসাইকেল-চাকরি-জমিজমা সব কিছু যদি সমগ্র আদিবাসীর একাংশেরও হয়, সে কি সচ্ছল মধ্যবিত্ত বা গ্রামীণ কুলাক হয়ে যায়? না, গোদা কথাটা এই, যে সে নিঃস্ব আদিবাসী সমাজেরও নয়, আবার প্রতিবেশী সমাজে তার যে শ্রেণী, সে শ্রেণীরও নয়? সে জন্যই বিপদে-সংকটে তাকে তার গরিব আদিবাসী সমাজের সঙ্গেই একাত্ম হতে হয় কী? সরপঞ্চ কেন প্রথমে 'আদিবাসীরা' ও পরে 'আমরা' বলল? সমস্যাটি বহুস্তরীয়। নিরাপদ দূরত্ব থেকে ফটাফট রায় দেওয়া অসমীচীন)।

—কোনো চটজলদি মীমাংসা কোরো না পূরণ, তুমি জানো আমি কী বলছি।

—সরপঞ্চজী! কী খবর জানাচ্ছে?

সরপঞ্চের চোখ এখন ধূসর, সুদূর।

—বি. ডি সাহেবের সঙ্গে এসেছেন, থাকবেন।

সরপঞ্চ শুকনো ঠোঁট চাটে। তারপর ঈষৎ ঝুঁকে পড়া শরীর (পূরণ পরে শুনেছে অবস্থা ফেরার আগেও বিলুপ্ত জঙ্গলে রিঠা ফল কুড়াত এবং গাছের ডাল ভেঙে ওর মেরুদণ্ড জখম হয়েছিল, সে সময়ে পিরথা নালার তীরে ময়ূর নাচত) সোজা করে দাঁড়ায় ও নিবাত নিষ্কম্প গলায় যেন জবানবন্দী দেয়।

—এখন তামাম ইলাকায় আমরা অশুচ হয়ে আছি, মৃতাশৌচ চলছে। এ সময়ে ইনি থাকবেন?

—মৃতাশৌচ কেন?

—আমরা যা দেখেছি, তা কী? বলুন বি. ডি. ও. সাহেব! আপনি তো লিখিপড়ি লোক, আদিবাসী ইলাকায় আপনি প্রথম সরকারের লোক যিনি এসেছিলেন। আমরা তো ভাবতাম আজাদ ভারত সরকার হয়েছে এটা গল্প কথা আমাদের কপালে। আপনাকে দেখলাম, আপনি বলুন, আমরা কী দেখেছি।

—জানি না।

—দেখেছি এটা মানেন ?

—হ্যাঁ, সকলের ভুল হবে না। তবে সেটা কি, কেমন পাখি-তা জানি না।

—শংকরের ভাইপো বিখিয়া ছবি এঁকেছে তা দেখেছেন আপনি।

—দেখেছি।

—আপনারা জানবেন না ও কী দেখেছে।

—তুমি বলো, ইনি জানতে চান।

—কেমন করে বুঝাব ?

হরিশরণ আস্তে বলে, সরপঞ্চজী ! আমার বন্ধু অনেক আদিবাসী ইলাকায় গিয়েছেন। এঁর দেশ বিহার। সেখানেও তোমাদের মতো অনেক আদিবাসী, বাইগা, বিরহড়, গোণ্ড, খাড়িয়া, খোন্দ, কোল, মুণ্ডা, নাগেসিয়া, ওরাও, অসুর, এরাও আছে।

—তা কেমন করে হবে ?

—আছে, আছে।

—আমরা সেখানেও আছি ?

—আছ, আছ।

—ইনি দেখেছেন ?

—দেখেছেন, সেখানে থেকেছেন।

—ইনি কি মহাজন ?

—না, পত্রকার। আদিবাসীর দুঃখ বিপদ জানলে দৌড়ান, কাগজে লিখেন।

—তাহলে কেন এখন এলেন ?

—আকালের কথা লিখবেন না ?

—কেমন আকাল ? আপনি বলেন, এস. ডি. ও. বলেন, আপনারা সরকার, তবু বড় সরকার মানে না। এ রকম তো বছর বছর হচ্ছে, না কেউ জানে, না কেউ মানে। পিরথাতে যে

মানুষ থাকে তাই জানে না সরকার।

হরিশরণ গলা আরো বিনম্র করে।

—জানি। সে জন্যেই চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে কোনোমতে পিরথার কথাটা সকলে জানে, বিধান সভায় ওঠে, রাজ্য সরকার কোনো সাহারা করে।

পূরণ আস্তে বলে, আদিবাসীর নামে কত টাকা আসে, তোমরা কোনো সহায়তা পাও না?

—কেমন করে বুঝাব আপনাদের?

শংকর এ সময়ে ঘুরে দাঁড়ায়, হাত মুঠো করে এবং তীব্র ব্যাকুলতায় বলে, অনেক, অনেক চাঁদ দেরি হয়ে গেছে। এখন আর কেউ আমাদের কোনো সাহারা দেখাতে পারবে না।

চাঁদ! অনেক চাঁদ! আকাশে যখন সূর্য অকরুণ? খাজড়া গাছের অসি-সদৃশ ভারি পাতাগুলি যখন স্থির, এবং শীর্ণপত্র পিপুল গাছটির একটি পাতা যখন তিরতির করে কাঁপছে? কত দেরি করে ফেলেছে হরিশরণ ও পূরণ?

শংকর চোখ বুজে বলে যায় কথা। হায়! ও হিন্দি বলছে, পূরণ ও হরিশরণও হিন্দি বলছে, তবু এ-ওকে ছুঁতে পারে কই? শংকরের বক্তব্য সে হিন্দীতে বলছে, কিন্তু অভিজ্ঞতাটি লক্ষ লক্ষ চাঁদ পুরনো, যখন ওরা হিন্দি বলত না। পূরণের মনে হয়, শংকররা কী ভাষায় কথা বলত, কী ভাষায় কথা বলে, তা পূরণ জানে না। আজকের ভারতবর্ষে আদিবাসীর জীবনে প্রত্যহের যে অভিজ্ঞতা তা বুঝাবার মতো শব্দও ওদের ভাষায় তো থাকে না। সিংভূমের হো-ভাষী, হো-জাতীয় পশুপতি জোংকো বীরসা মুণ্ডার জীবনী হো ভাষায় অনুবাদ করার সময়ে নম্র বিস্ময়ে বলেছিল যে হো ভাষায় "শোষণ", 'বঞ্চনা"—এর সমার্থক শব্দ নেই। সেদিন পূরণের মাথায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

সেটা "সেগুন হটাও, শাল বাঁচাও", সাগোয়ানা লড়াইয়ের

সময়। আরণ্য সিংভূম উত্তাল, উত্তাল। গুয়াতে গুলি চলেছিল। হো ভাষায় "শোষণ" শব্দের সমার্থক শব্দ নেই। তারপর কত গুলি চলল কতবার। হো, মুণ্ডারি, সাঁওতালিতে শাল হল সাজোম, কিন্তু সাগোবানাথ অসমাপ্ত সংগ্রাম যেখানে, সেখানে "শোষণ" শব্দ বোঝানো যায় না তারপর ইলিয়াগড়ে খড়কাই বাঁধ সংঘর্ষে বীর কোলহো গঙ্গারাম কালুণ্ডিয়া মরে যায়। গুয়াতে আবার মরে বিদন নাগ নির্মম প্রহারে, আর পশুপতি জোংকো বলে, দাদা! "শোষণ" শব্দ তো হো ভাষায় নেই। পুরণের মনে হয়, যাদের জীবনে শুধুই শোষণ, শুধু বঞ্চনা, সেই আদিবাসীদের কোনো ভাষাতেই কি আছে "শোষণ" শব্দের সমার্থক শব্দ? কিন্তু তাত্ত্বিক কামাল, যে পড়ে থাকে আদিবাসী ক্ষেত্রে, সেও তো মাথার মধ্যে তার পুঁথিপড়া তত্ত্বের কাচের দেয়াল টপকাতে পারে না এবং মাঝে মাঝে যখন উদয় হয়, তখন বলে, ইয়ার! ওদের মধ্যে শ্রেণী বদল ঘটছে, ছোট হলেও একটা শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা স্বজাতিকে শোষণ ও বঞ্চনা করছে।

সরস্বতী কি রেগে উঠেছিল?

—হাঁ হাঁ, আমার-আপনার সমাজে একজন অন্যদের বঞ্চিত করে কোটি কোটি কালো টাকা বানাতে পারে, বিদেশে রাখতে পারে, সেটা খুব মেনে নেন। আর ওদের সমাজের নিজস্ব যা, সব আমরা কেড়ে নিয়েছি, আমাদের পচা মূল্যবোধ ওদের উপর চাপাচ্ছি, তারপর ওদের কেউ যদি সামান্য টাকা করল, বা আমাদের মতো হয়ে গেল, আমরা নিরাপদ দূরত্বে বসে ওদেরকে গাল দিচ্ছি। বলছি, দেখ দেখ! ও লোকটার চরিত্র কি বদলে গেছে, ও আর আদিবাসী নেই।

গোটা ব্যাপারটাই খুব জটিল। চট করে কিছু বলে বসা পাপ। শংকর নাগেসিয়া কী বলছে? পুরণের মনে বাজে দমকলের ঘণ্টা। শংকরের কথা ওকে বুঝতে হবে, নইলে সরস্বতীর ব্যাপারে

নিজের বা সরস্বতীর ওপর সুবিচার করা যাবে না। সেদিন সরস্বতী ওকে অবাক করে দিয়েছিল।

শংকর কথা বলে।

যেন গাথা গাইছে। ওরা তো ইতিহাস ধরে রেখেছে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু-সমাজবিচার এইসব নিয়ম পালনের মধ্য দিয়ে। লেখার লিপি নেই, গানে গানে ধরে রেখেছে অতীতের কথা।

—এক সময়ে বন ছিল, পাহাড় ছিল, নদী ছিল, আমরা ছিলাম। আমাদের গ্রাম ছিল, ঘর ছিল, জমি ছিল, আমরা ছিলাম। আমাদের খেতে আবাদ হত, ধান, কোদো, কুটকি, সোমা, আমরা ছিলাম। তখন শিকার ছিল। বৃষ্টি হত, ময়ূর নাচত, আমরা ছিলাম। মানুষ বেড়ে যেত, সংসার বেড়ে যেত, আমরা কিছু মানুষ চলে যেতাম দূরে। পৃথিবীর কাছে বলে নিতাম, ঘর বাঁধতে খুঁটি পুঁতছি, চাষ করব তাই জমি হাসিল করব। আমাদের সমাজপতি বলে দিত কোথায় আমরা বসত করলে বাস করতে পারব। সেইখানে বেঁধে নিতাম ঘর, গড়ে নিতাম গ্রাম, যে-যার মতো জমি হাসিল করতাম। গাছ আমাদের গ্রাম দেবতা, গাছকে পুজো দিতাম। তখন আমরা ছিলাম, শুধু আমরা ছিলাম।

শংকর দৌড়ে ঘুরে চারদিক দেখায়।

—মরে গেলে আমরা তাদের সমাধি দিতাম। মৃতদেহটি চৌমাথায় নামাতাম। ছড়িয়ে দিতাম কোদোর দানা, ধানের বীজ। তারপর সমাধি দেবার সময়ে সঙ্গে দিতাম তেল, বস্ত্র, ধান, ফল। শুইয়ে দিতাম তাকে পূর্বপুরুষদের কাছে। শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে সমাধির ওপর দিতাম পাথর। এমন শ্মশানভূমি অনেক, অনেক। পূর্বপুরুষদের আত্মা শান্তি পেত। আমাদের আশীর্বাদ করত। আমরা ছিলাম। আর এখন?

—হায় হায়! বানের আগে যেমন পিঁপড়ে ওঠে, বর্ষার আগে

যেমন উইপোকা ওড়ে লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে, তেমনি করে আমাদের খবর চলে গেল ভিন মানুষের কাছে। আমাদের কি পূজা পরবে কোনো ত্রুটি হয়েছিল? ফাল্গুনে গাছে নতুন ফল নতুন পাতা, নতুন ফুল আসার আগে কি কেউ পরবপূজা না হতে ছিঁড়েছিল গাছের পাতা? শিকারে গিয়ে কেউ কি মেরেছি গর্ভিণী হরিণী? প্রাচীন বয়স্কদের কেউ কি অসম্মান করেছিল? সমাজের নিয়ম অনাথ শিশুকে রক্ষা করা, কোথাও কি সে নিয়ম মানা হয় নি? জানি না, কোথায় দোষ হয়ে গেল আমাদের।

—কেন এল ভিনদেশী মানুষ? আমরা রাজা ছিলাম, প্রজা হলাম। প্রজা ছিলাম, দাস হলাম। অঋণী ছিলাম, দেনাদার করে দিল। দাস করে বেঁধে রেখে দিল হায়! নাম দিল হরোয়াহি মাহিদার, নাম দিল হালি, নাম দিল কামিয়া। দেশ চলে গেল ঝড়ের মুখে ধুলোর মতো চলে গেল জমি, ঘর, সব। যারা এল তারা তো মানুষ নয়। হায় হায়! পাহাড়ে উঠে ঘর বাঁধি, রাস্তা আমাদের তাড়া করে আসে। অরণ্য চলে যায়, চারদিক ওরা অশুচি করে দেয়। পূর্বপুরুষের সমাধি ছিল, হায় হায়! তা গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে সেখানে হল পথ, বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল। এর কোনোটা আমরা চাইনি, আমাদের জন্যেও করেনি।

—হায় হায়! দুঃখে আমরা পাথর, আমরা বোবা। পূর্বপুরুষদের আমরা শান্তি দিতে পারলাম না। আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, মুছে যাচ্ছি মাটি থেকে। তাই পূর্বপুরুষদের অশান্ত আত্মা এখন ছায়া ফেলে ঘুরে যাচ্ছে। আমরা তো জানতাম না কী রকম হবে তার চেহারা। এ নিশ্চয় পূর্বপুরুষদের আত্মা! নিশ্চয় লুঠ হয়ে যাওয়া দেশ, গ্রাম, জমি ঘর, অরণ্যের অভিশাপ। এখন আমাদের কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। আমরা সবাই অশৌচে পড়ে গেলাম। সাহেব! বি. ডি. ও. সাহেব!

—এই তো আমি।

—আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অনেক বিনীত করে বলছি, তুমি আমাদের কিছু করতে পারবে না। তোমরা আমাদের জীবনে ঢুকে গেছ তো আমরা অশুচ হয়ে গেছি। আর রাস্তা নয়,—রিলিফ নয়,—দেশ, ঘর, জমি, শ্মশান সব চলে যায়, তার বদলে তুমি তাদের কী দেবে?

খুব কাছে এসে শংকর বলে, দূরে চলে যেতে পার? অনেক দূরে? অনেক, অনেক দূরে?

শংকর ঢলে পড়ে, অজ্ঞান হয়ে যায়।

ওকে গাছের নিচে নিয়ে যায় কয়েকজন।

—কী হল?

—অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—তা হলে?

—ওরা জল দেবে, জ্ঞান ফিরবে।

হরিশরণ বলে, চলো বসি।

ওরা একটি দড়ির খাটিয়ায় বসে। হরিশরণ বলে, এই কথাগুলো তিনজনের মুখে তিনবার শুনলাম। পিরথা, ঢোলকি, গাবহি, তিন গ্রামের তিনজনের মুখে একই কথা শুনলাম। কোনো একটা ব্যাপার ঘটছে রহস্যময়। প্রত্যেকবারই যেন একটা ঘোরের ভরে কথা বলে যায়, কথা বলে যায়। যখন বলে, তখন কেউ ওকে ছোঁয় না, কথা বলে না। তারপর বক্তা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

—এখন কী করবে?

—ম্যান! আমি তো জায়গাটাকে পাঁচশো বছর আগের মতো করে দিতে পারব না। তেমন আদিম স্বাধীনতা কোনো ম্যাজিশিয়ান যদি ফিরিয়েও দেয়, ওরা সে স্বাধীনতা বহিরাগতদের হাতে আবার হারাবে। কেননা ওরা জানে, বা জানত সাম্য, মৈত্রী, সহাবস্থান। আগ্রাসন, লুণ্ঠন, শোষণ, জনজাতিকে

ব্যবহার, এ সবের সঙ্গে কি ওদের নির্মল মূল্যবোধ নিয়ে লড়া যায়? এটা বাস্তব, এটা ইতিহাস।

—কিন্তু ওরা যদি রিলিফ না নেয়?

—আর তোমাকেও বুঝতে হবে যে যখন আজকের কোনো মধ্য ভারত সিভিল সার্ভিসের লোক, একটি প্রাচীন জাতির কাছে বহমান পিরথা নদী, বিস্তৃত অরণ্য, তেমন শস্যক্ষেত্র যাতে হরিণ বা ময়ূর বা অন্য পাখি ছাড়া আর কারো আক্রমণের ভয় নেই, সেই নিশ্চিন্ত পরব-উৎসবের নাচ যা লাফাঙ্গারা দেখবে না, ফটো উঠাবে না, সেই অন্যের গাঁইতি-শাবলের চোট পড়বে না এমন সমাধিস্থান, কিছু ফিরে দিতে পারে না। এরা চায় লুণ্ঠিত জাতিগত পরিচয়, হৃত সম্মান, হরোয়াহি মাহিদার-হালি-কামিয়া নামের দাসত্ব থেকে মুক্তি,—আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ভাই। আমি সরকারি নানা বিভাগের সঙ্গে তুমুল লড়াই করে ওদের কাছে আনতে পারি সামান্য চাল, ওষুধ, দুধের গুঁড়ো। আর একবার সুরজ, একবার তোমার দ্বারস্থ হচ্ছি কেন? যাতে "পিরথা" নামটা যে আছে, তা মানুষ জানে, যাতে পিরথা কানালটা হয়, যতদিন এই এস. ডি. ও. আছে, ততদিনে না হলে···

হরিশরণ সম্পূর্ণ অন্য গলায় বলে, সরপঞ্চ! জল খাব।

জল আসে, সঙ্গে কিছু মকাই ছাতু ও গুড়ের লাড্ডু। ওরা লাড্ডু ফিরিয়ে দেয়, জল খায়।

—সরপঞ্চ জলদি ক্যাম্প লাগাও।

—পিরথা চলুন।

এখন দৃশ্য বদল ঘটে। শংকর উঠে বসে, গায়ের ধুলো ঝাড়ে, জল খায়। কোথা থেকে এসে পড়ে জনা দশেক লোক, যাদের সরপঞ্চ প্রচুর গালাগালি দেয়।

—বি. ডি. ও. সাহেব বসে থাকতে আসেনি। এটা পাবলিকের কাজ, আর সরকার সে কাজ করাচ্ছে। আরো লোক

কোথায়, গাড়ি কোথায়? গাবহি গ্রামের নাম ডুবে যাবে। তোমরা তো খেতে পাচ্ছ. তোমরা তো আকালে পড়নি!

আরো কিছু লোক আসে। মোষের গাড়ি টেনে আনে মানুষ। মোষ মাল টেনে ওপরে উঠতে মরে যেতে পারে।

শংকর বলে, আমি আগে চলে যাই?

—না, সঙ্গেই চলো।

হঠাৎ ঝটপট মাল নেমে যায়, গাড়িতে ওঠে। সরপঞ্চের বাড়িতে কিছু মাল রাখা হয়। গাবহিতেও আদিবাসী আছে।

এখন তারা সামনে আসছে না।

—কেন?

—পিরথা গেলেই বুঝবে।

—সরপঞ্চ রিলিফ দেবে তো গাবহিতে?

—তা দেবে। এখন আতঙ্কের ফলে সবাই ভাল হয়ে গেছে। নইলে সরপঞ্চ যদি আগে রিপোর্ট করত · স্বাস্থ্যসেবক বলল, আমরাও খবর পেলাম যে পিরথায় সমানে একজন দু-জন মরছে। আমি চলে এলাম। মরলেও সরকার কিন্তু কিছুতে বলবে না আকাল। আকাল না কি তখনি বলা চলে, যখন একটা বিশেষ পারসেন্টেজ মানুষ মরে। এখানে মানুষ আছে কত, যে লাখে লাখে মরবে? ওরা তো বঞ্চনার শিকার, অন্যরা দেখ গে সমতলে,—দিব্যি চাষ করছে।

—এবার আকালের কারণ কী?

—মানুষের তৈরি। বরাবরই এখানে তাই। জল নেই, কোদো কুটকি চাষও করতে পারেনি। মাঝে একদিন বৃষ্টি হয়ে আরো সর্বনাশ হল

—বৃষ্টিতে সর্বনাশ?

—আমি ছিলাম না, ইন্দোর গিয়েছিলাম। হঠাৎ হুড়কো এল "এ সপ্তাহ কৃষিতে সহায়তা সপ্তাহ।" ব্লক থেকে মক্কেলরা এসে দেখে চাষবাসের নাম নেই. ধুলোট শস্যক্ষেত্রে কীটনাশক

ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। বোঝো ব্যাপারটা। দেখছিস মাঠ জ্বলে গেছে···

—কেন করল ?

—আমাকে টাইট দিল ! কীটনাশক বলো, সার বলো, আমার ব্লকেও আসে। যাদের জমি আছে তারা পায়। অন্যত্র আদিবাসীদের ব্লক থেকে দেয়, নামে দেয়, মাল দেয় না, সামান্য টাকা দিয়ে বলে কিনে নিলাম।

—হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক ঋণেও মার খায়, মিনিকিটেও।

—এখানে তো আদিবাসীদের নামে যা বরাদ্দ, তা বিক্রি চলছিল। আমি চুরি ধরলাম, সাসপেন্ড করালাম। এরা সেই রাগে এবার আমাকে ফাঁসাল।

—হলটা কী ?

—একদিন বৃষ্টি হল।

হরিশরণ চোখ কুঁচকে ওপরে তাকায়. মেঘ খোঁজে। মেঘ নেই। আকাশবিহারী নীরদবাহন জল চলে গেছে মালব, উজ্জয়িনী বিদর্ভের খোঁজে।

—বৃষ্টি তো দরকার।

—এই বৃষ্টিতে মাঠ, পাহাড়ের ঢালে চাষের জমি এবং সেই বিষ ধুয়ে জল নামল ওদের কাটা মাটকুয়াতে। তাতে সিমেন্টের রিং আমিই বসিয়েছিলাম। দুটো মাটকুয়াতে জল, তাও সামান্য জল। পানীয় জল তো ওরা রেশন করেই খায় বরাবর।

—জল রেশন করে খায় ?

···বরাবর। যথেচ্ছ জল খেতে পায় বর্ষণ কালে, তারপর কিছুদিন প্রকৃতি. প্রশাসন. সবই যখন বিরোধী দলে চলে গেছে, টিঁকে থাকার তাগিদে অমন ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করে নেয়। না নিয়ে কী করবে ?

—সেই জল খেয়ে মরল ?

—সেই জল খেয়ে মরল। খাজড়ার কন্দমূলই ওদের প্রধান ভরসা। গাছের গোড়াও তো সে জল টেনেছিল। খাজড়ার মূলকন্দ খেয়েও মরল। তারপর মরতেই থাকল মাসে কয়েকজন করে। কিন্তু মরলেও জানছ না তুমি, যদি না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছয় রোগী। রাজোরা আর পিরথার মাঝামাঝি স্বাস্থ্যকেন্দ্র একমাত্র ভালপুরায়। চমৎকার একটা মন্দির আছে। খাজুরাহোর মতো, ছোট।

—কতদূর?

—কেমন পথে উঠছ?

পাহাড়ের ঢাল ক্রমে খাড়াই হচ্ছে।

—কঠিন পথ।

—এই পথে চার কিলোমিটার, তারপর পাঁচ কিলোমিটার। তবু শংকর খবর দিয়েছিল, স্বাস্থ্যসেবক এসেছিল। ডুলি করে বড়দের, বাঁকে ঝুড়িতে শিশুদের নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। সেখানে ডাক্তার তো মৃত্যুর কারণ অনাহার, খাদ্যাভাব, এ সব বলবে না।

—তুমি জানলে কী করে?

—স্বাস্থ্যসেবক বলল। আমি এসে সরপঞ্চকে যাচ্ছেতাই বললাম। সে বলল, হাসপাতালে নিলেও মরছে, না নিলেও মরছে, তাই খবর দিইনি।

—ও কিছুই করেনি?

—পুজো দিচ্ছিল।

—কী রকম লোক?

—ও কী জানে? কতটা জানে? এখনকার রোগভোগে ডাক্তাররাই বুঝে উঠতে পারে না। আদিবাসী কিছুদূর বোঝে, তাদের নিজস্ব চিকিৎসকও আছে। আদিবাসী নয় এমন গ্রাম বৈদ্যও আছে। কিন্তু সংক্রামক আন্ত্রিক, ক্যানসার, করোনারি,

এমন অনেক রোগের ব্যাপারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারই হয় বোঝে না, নয় কিছু করতে পারে না। আদিবাসীদের কাছে তো বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থাও আমরা এনে দিইনি। তাদের জানার সীমানার বাইরে কিছু ঘটলে ওরা ভাবে দৈব রোষ, ডাইনির নজর, কোনো রহস্যময় কারণে এসব ঘটছে।

—তখন তুমি এলে?

—এলাম। ততদিনে দু-বার ট্রাক এসে গেছে। ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে গেছে পাঁচটি বালিকা, তরুণী, শিশুকে। মানুষ কিনে নিয়ে গেছে কয়েক বস্তা কোদো দিয়ে।

—এসে কী করলে?

—গাবহি থেকে পানীয় জল আনালাম। কিছু কোদো মকাই তো এনেছিলাম। সেই মাটকুয়া দুটো বন্ধ করলাম। একেকবার কিছু রিলিফ আনছি দাঁতে নখে লড়াই করে। রাজ্যমন্ত্রী মায়লেকে ধমক দিয়েছে যে রিলিফ মানেই দুর্ভিক্ষে রিলিফ। জোর করে তোমরা সরকারকে দিয়ে "দুর্ভিক্ষ" বলাতে চাইছ। এটা হতে পারে না।

দুর্ভিক্ষ! কোনো জেলায় অত্যন্ত, চরম, খাদ্যাভাব, জলের মতো জিনিসের নিদারুণ অভাব, খাদ্যাভাবের জন্য খাদ্যবস্তুর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্যাপক ক্ষুধা, অনশন।

কিন্তু ভারতের আদিবাসী অঞ্চলের প্রেক্ষিতে তো বলতে হয়, অয়ি অভিধান যত, মূক করো মুখর ভাষণ, ওগো মিথ্যাবাদী! কেমন করে তোমার কথা মানি, শুনি তোমার বাণী?

কেননা মাধোপুর জেলাতে চরম খাদ্যাভাব হয়নি। মাধোপুর, সদরে খাদ্যশস্য ডীলারদের বড় দোকান, খাবারের দোকানে মিঠাই যত মাছিও তত। একটি শিবমন্দিরের চাতালে উপবিষ্ট ষাঁড়কে জনৈক যুবতী বধূ জিলিপি খাওয়াচ্ছিল এবং শিবের মাথায় যত দুধ ঢালা হচ্ছিল তা জমছিল দুধপচা দুর্গন্ধ আবিল এক কুন্ডে,

ভক্তরা দুধকুণ্ডের সে দুধ নিচ্ছিল, খাচ্ছিল।

জেলায় তো খাদ্যাভাব নেই।

জলের অভাব নেই। ম্যাজিস্ট্রেট ও এস ডি. ও-র বাড়িতে পাইপে জল উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে, ঘাস কি সতেজ, গাছ কি সবুজ। আর জলে সিঞ্চিত সবুজ শস্যক্ষেত্রও তো অনেক। ভালপুরার পথে দু-দিকের মাঠই ছিল সবুজ, শস্যে উদ্ধত।

খাদ্যাভাবের জন্য খাদ্যবস্তুর দাম তো বাড়েনি। এখন ট্রাকটরে চাষ, স্যালো বসিয়ে জল তোলা, কৃত্রিম সার প্রয়োগ,—এক আঁটি মকাইয়ের দাম থেকেও খরচ তুলে নিতে হয়। সবুজ বিপ্লব মানে দামেও উর্ধমুখী বিপ্লব।

মাধোপুরায় ব্যাপক ক্ষুধা অনশন নেই। সেচসেবিত কৃষিভূমি উচ্চবর্ণের হাতে। পার্বত্য মাধোপুরা আদিবাসীদের, যাদের কৃষিভূমি, তারা তো ক্ষুধার্ত নয়, অনশনে অনন্যোপায় নয়। যত গণ্ডগোল কৃষি ঘিরে। সমতলে আদিবাসীর জমি থাকলেও এখন সে জমিতে পা রাখতে পারে না কত জায়গায়। "আদিবাসীর জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ এবং বিগত বারো বৎসরের মধ্যে (পশ্চিমবঙ্গে আইন সংশোধনের পর বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে) জমি হস্তান্তরিত হইলে, আপাতদৃষ্টিতে তাই আইনসম্মতভাবে কোবালা, দানপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে হইলেও, অ-আদিবাসী কর্তৃক খরিদ জমি আদিবাসী প্রমাণ দাখিলে তাহা ফেরত পাইবেন। এমন ক্ষেত্রে আদিবাসী আদালত সাহায্যে এ জমি ফেরত পাইবেন। এই মামলা আদালতে গেলে আদিবাসীর স্বার্থ দেখার বিশেষ অধিকার পাইয়াছেন তফসিলী জাতি ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের অফিসার এবং স্পেশাল অফিসার। এ জাতীয় মামলা ক্ষেত্রে তাঁহারা ভূমি রাজস্ব বিভাগের স্পেশাল অফিসারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

কিন্তু লীগাল-এইড সেল একটি ধাপ্পা। আর এখন তো

ভারতের পশ্চিম থেকে পূর্ব, উত্তর থেকে দক্ষিণ, আদিবাসীর জমি হস্তান্তরের ব্যাপারও নেই। রাজনীতিক মদতে অ-আদিবাসী জাল আদিবাসী নামে আদিবাসীর জমি কিনছে। যার জমি সে টাকা পায় না, ভিতর ভিতর ব্যবস্থা। ভূমিরাজস্ব বিভাগের যে সব লোক গ্রামেগঞ্জে বসে আছে, তারা সৎ হলে বদলি হয় এবং যখন দেখে পার্টি'ই সব. প্রশাসন বৃহন্নলা, সেও "হ্যাঁ" বলে। কেউ টাকা খায়, সবাই খায় না। সসাগরা জম্বুদ্বীপে অনার্য, অসুর. বৃচীবৎ, রাক্ষস, বানররা (বেদ থেকে পুরাণে ওদের কত নাম) দেখছে, তার নামে জমির খাজনা দেওয়া হচ্ছে, তার মালিকানা দেখিয়ে প্রভাবশালী ডাকাতরা "আদিবাসীর জমি" বলে সেচ, খাদান, বীজ নিচ্ছে, এবং তার সে শস্যে মালিকানা নেই। প্রতিবাদে মৃত্যু। ডাকাতদের পায়ে পড়লে সে জমিতে সে মজুর হিসেবে কাজ পেলেও পেতে পারে। এখন ডাকাতদের ঘোড়া চেপে বন্দুক ফোটানোর দরকার পড়ে না। গ্রামে বসে, রাজনীতিক প্রভাব থাকলে গরীবদের সন্ত্রাসিত রাখে. বিরোধী রাজনীতির লোকদের মুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলে যে ডাকাত, তার ঘোড়া চড়ার বা বন্দুক ফোটাবার দরকার হয় না। সে পাঁচজনের মতোই মাঠে হাগে, তেল মেখে স্নান করে, এবং সন্ধ্যায় কোনো মহাপুরুষের ছবি থেকে কখন বিভূতি ঝরবে সেজন্য চেয়ে থাকে।

ভারতে দুর্ভিক্ষও কে বা কাহাদের হাতে কেনা-বেচা হয়ে আছে গো। কালাহাণ্ডি বা মাধোপুরায় বা যে কোনো জায়গায় দুর্গম পার্বত্য বা আরণ্য এলাকায় আদিবাসী বেলটে চিরকাল লাগিয়ে রাখা হয় মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ।

যত গোলমাল কৃষিক্ষেত্রে. স্বয়ম্ভর হবার ব্যাংক ঋণ গ্রহণে। ঋণ ব্যাপারটাই জটিল, জটিল, তা মানুষকে হিংস্র করে। নইলে বিলাসপুর জেলায় এক হরিজন এক ঘাতক জনতা নিয়ে ঋণ শোধে অক্ষম দুই হরিজনের চোখ উপড়ে নেবে কেন?

এ রকম সর্বত্র, সর্বত্র। এই রক্তাক্ত বধ্যভূমি, এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ, এই মৃত্যু উপত্যকা কেন পূরণের দেশ হল ?

খাজড়া গাছের মাটির ওপরে জেগে থাকা অংশটি ছোট, ওর মূল নাকি আড়াই তিন হাত লম্বা। গাছের পাতা ঘন সবুজ, পাশে কাঁটা। নরকে যাবার পথে এই গাছের বনকেই কি বলত অসিপত্র বন ? খাজড়া গাছের ঘনত্ব বাড়ছে।

হরিশরণ বলে, গরিবের কল্পতরু! গাছটার পাতা চিরে চাটাই বানাবে, মূলটা তুলে নেবে নিচের অংশটা রেখে। আবার গাছ গজাবে। আর তুলে না নিলে মূলের নিচের অংশটা ছড়িয়ে যাবে, তা থেকে আরো গাছ উঠবে।

—আঁশ দড়ি হয় ?

—তেমন আঁশ নয়।

—পালামৌয়ে চাষ করছে।

—দড়ির জন্যে ?

—হ্যাঁ।

—সেটা "এলো" প্লান্ট ইয়ার। তার আঁশে ম্যানিলা রোপের মতো শক্ত দড়ি হয়। কেরলে তার মূল খায়। এটা যে জাতের, ঠিক সে জিনিস নয়। দড়ি হয়! আমি এখনো ইচ্ছা রাখি যে মেয়েদের সমবায় করে দিতাম এই চাটাই বোনার, মেয়েরা তার মালিক হত। দড়ি হবে! আমাদের অবস্থা দেখ না। সরকার গরিবি হটাবেই। কত রকম নতুন প্রকল্প করেছে, ম্যান, কেমন করে তা দেখাব ? আদিবাসীর সহায়তা মেলে না বাঁচবার, এবং তাকে বাঁচাবার জন্যে যত চমৎকার স্কীম, কত কোটি টাকা, আমরা সে সব স্কীমকে কাজ করে দেখাব, তার সহায়তাও করে না সরকার।

—খুব মুশকিল।

—টাকা ফেরত যাবে তাও ভাল, কিন্তু···মাধোপুরাতে তো

এমনই হবে। মধ্যপ্রদেশ ছিল মধ্যভারত, বড় ছোট সামন্ত রাজাদের দেশ। এখনো মাঝে মাঝে স্বামীর চিতায় পুড়ে সতী হবার তোড়জোড় করে মহিলারা। কিন্তু খাজড়া গাছ।

-- ব্যাপারটা তা নয়। ভারতে বনের ব্যাপারে…

সুরজপ্রতাপ, হ্যাঁ সুরজপ্রতাপ লিখেছিল। ভারতে নানা ধরনের বন ছিল। গাছ ও বনজ দ্রব্যের ট্রাডিশনাল ব্যবহার ছিল। অন্য দেশ হলে সেই বনকে বাড়িয়ে, নতুন নতুন ভাবে গাছকে মানুষের সেবায়, সাহায্যে লাগানো হত। আমাদের দেশে স্বভাবজ বন ধ্বংস করা হল। বনজীবী মানুষকে কোনো নতুন ব্যবহার শেখানো হল না। পালামৌ থেকে ভারতে এত লাক্ষা মিলত, পলাশের লাক্ষা, পলাশ ওখানে গ্রাম দেবতা,—পলাশ সাফ। আর এই যে এখন বাঁজা জমিতে "এলো" চাষ, এও তো এক খেলা। ম্যান! চটের নয়, পলিথিনের বস্তা চলছে। এলোর সুতোর দড়ির চেয়ে সিনথেটিক সুতোর দড়ি অনেক মজবুত।

পথ শেষ হচ্ছে না। শংকর পাথর পাথর মুখে চলেছে। হরিশরণ বলে, ১৯১৩-১৪-তে মধ্যপ্রদেশেও সবুজ বিপ্লব।

ব্রেনের কম্পুটার কেন এত খবর জমিয়ে রাখে, মাথাকে করে বিস্ফোরক? ভারতে প্রথম সবুজ বিপ্লব ১৯১৭-১৮-তে সীমাবদ্ধ হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমে। দ্বিতীয় সবুজ-বিপ্লব ঘটে যায় ১৯১৩-১৪-তে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশেও। তবু কেন বিহারের কৃষিক্ষেত্র জ্বলে ওঠে বারবার প্রতিবাদে, সাংবাদিক দৌড়য় কালাহান্ডিতে, মধ্যপ্রদেশে ভীল পরিবার করে আত্মহত্যা, আর ঠিকাদাররা ওই সব রাজ্য থেকেও নিরন্তর নিয়ে যায় বেগার মজুর। মাইগ্রেন্ট লেবার অ্যাক্ট যাদের জন্য, দুটো ভাতের জন্যে কেন ওই সব দেশের নিরন্ন আদিবাসী, নিরন্ন গরিব, দাস-মজুর হয়ে যায়,

যাচ্ছে, নিরন্তর ? হরিয়ানা ও ফরিদাবাদের দাস-মজুরদের কেস কেন ওঠে সুপ্রীম কোর্টে ?

'ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি ঘটেছে অসামান্য। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কৃষিকার্যের ফলে ভারতবর্ষ শুধু যে খরা ও বন্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম হচ্ছে তাই নয়। এশিয়া ও আফ্রিকার তুলনামূলক ভাবে ভারতের চেয়ে কম সৌভাগ্যবান দেশগুলিকে দিচ্ছে খাদ্য সাহায্য।"

ভারতবর্ষ ১৯১৫-১৬-তে ১৪৬ মিলিয়ন টন থেকে ১৪৮.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য এবং ৩২.৬ মিলিয়ন টন তৈলবীজ এবং ১৭৫ মিলিয়ন টন আখ, ৮.৫ মিলিয়ন বেল তুলা এবং ১১.৪ মিলিয়ন বেল পাট ও মেস্তা উৎপাদন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের শতকরা পঁচিশ ভাগ মশলা ভারত পাঠায়।

তার প্রতিফলন নেই কেন হিমাচল থেকে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান থেকে পূর্ব ভারতে ?

মিলিয়ন মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য, সবুজ বিপ্লব মধ্য ভারতে, ওড়িশায়, বিহারে পশ্চিমবঙ্গে। তাহলে কেন দারিদ্র, কুলী-ঠিকাদারের খোঁজে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশান্তরী হওয়া ?

—ম্যাপের জন্তুটার চোয়াল ও দাঁতে ঢুকে গেলে পূরণ। জুতো খোলো।

হ্যাঁ, ওরা ঢুকে গেছে। সামনে, পাশে, পাহাড়ের ঢালে মিলে থাকা কয়েকটি ঘর।

—ঘরের গায়ে চক দিয়ে দাগ কিসের ?

—ওখানে মানুষ মরেছে।

—সামনে অত ভিড় কিসের ?

—দেখতে পাবে। এখন কথা বোলো না।

একটি ঘরকে দূরে রেখে কিছু মানুষ গোল হয়ে বসে আছে।

ঘরটি উঁচুতে। তার বারান্দায় বসে আছে এক শীর্ণদেহ কিশোর। তার চুল কটাসে, চোখ খুব উজ্জ্বল। এই ঘর, সব ঘরেরই ভিত ও দেয়ালের খানিকটা পাথরের। বাকিটা মাটির। চাল, কাশ জাতীয় কোনো ঘাসের।

ঘরের ভিতে খোদাই করা সেই ছবি। বাদুড়ের মতো যার জোড়া ডানা, অতিকায় গোসাপের মতো শরীর, নখওয়ালা চারটি পা, হাঁ-করা বীভৎস মুখে দাঁত নেই।

ছেলেটির গলায় সুতো পাকানো মালা।

—বিখিয়া। ওই এঁকেছে।

—খোদাই করেছে তো!

—বিখিয়া চকে আঁকে সেই ফটোই তোলা হয়। পরে খোদাই করেছে।

—ওই করেছে?

—ওরা সবাই পারে। প্রতি বাড়িতে দেয়ালে এমন খোদাই করা ছবি পাবে।

—কি আঁকে।

গাছ, ফুল, বানর, হাতি, পাখি।

—পূর্বপুরুষদের অশান্ত আত্মার ছবি এঁকে বিখিয়া বোবা হয়ে আছে। কথা বলতে পারে। বলবে না। শংকর জিনিস-পত্র আনো।

একটি ডিম, কিছু ফুল পাতা, মাটির সরায় চাল, সিঁদুর ও তেল হরিশরণ সাজিয়ে ফেলে। তারপর হাত জোড় করে বলে, পূজা করো তোমরা। আমরা পূজা দিয়ে তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে তারপর কাজ শুরু করব।

অনেক জোড়া নির্বাক, ম্লান চোখ। যেন অনেক দূর থেকে চেয়ে আছে।

—তোমরা অনুমতি দাও।

এখন আবার মৃদু মৃদু বাজে ঢোমরা একসঙ্গে বাজে বলে শব্দের এক ঐক্যতান। পুরোহিত উঠে আসে। কঙ্কালসার শীর্ণ হাতে ডিম বলি দেয়, চাল নিবেদন করে। সকল পুরুষদের চেহারা অশৌচের চেহারা। কঙ্কাল জননীদের বুকে মুখ রেখে লেপটে থাকা এঁটুলির মতো শিশু।

নিশ্বাস ফেলে ঘাম মুছে সরপঞ্চ হরিশরণের দিকে তাকায়। হরিশরণ বলে, কোথায় ক্যাম্প লাগাচ্ছ?

শংকর বলে, এই ঘরেই উঠাও। এখান থেকেই দেওয়া যাবে। ও ঘরে তো কেউ থাকবে না।

—বিখিয়া কোথায় থাকছে?

—বারান্দায়।

—আমার বন্ধু কোথায় থাকবে?

—এ ঘরের পিছনে। দাহি তো মরে গেছে, এর ছেলেও। ওর বউ চলে গেছে ঢোলকি।

পুরোহিত পুজা শেষ করে ও বলে, এখন আমাদের কোনো ভালাই কেউ করতে পারবে না। তবু এই সরকার সাহেব যখন এসেছে, ওকে আমরা ফিরাতে পারি না। বলো সরকার, কী করতে হবে।

—দেখ কী করি। যদি পারো কিছু মানুষ আমাদের সাহায্য করো।

পুরণ দেখতে থাকে, দেখতে থাকে। পাথর দিয়ে উনোন বানানো হয়। কড়াই আর হাণ্ডাও এসেছে। গরম জলে পাতলা করে দুধের গুঁড়ো গোলা হয়। শংকর ঘর ঘর ঘুরে পাত্র আনে।

—দুধ মাদের কাছে পেঁাছে দাও বাচ্চাদের জন্যে। নিক, খেয়ে নিক মায়েরা, আবার দাও, বাচ্চাদের দাও।

সরপঞ্চও হাত লাগায়। আজ রিলিফ মকাইয়ের খইয়ের

গুঁড়ো ও ভুরা গুড়।

—চাল কালকে দেবে। আজ দিলে কাঁচা খেয়ে নেবে।

—সরকার! এ তো আজ আর কাল। তারপর?

—একবার চালু তো করো। পরশু মহাবীর জনসেবার কৌশলজী দেবেন চাল, কোদো, মকাই। কিন্তু ওঁরা কিচেন চালাবেন আর রান্না খাবার দেবেন। দেখি! ওঁদের জনসেবা ডাক্তার পাঠায় কি না। তোমার কাজ, মাটকুয়া কাটাও। কুয়া লাগাও সরপঞ্চ, সিমেন্টের রিং হোক বা না হোক।

পুরেণ ও হরিশরণ এখন বাটতে থাকে খইগুঁড়ো, ভুরা গুড়। জল আনে সরপঞ্চের লোকরা বাঁকে বহে। শংকর লোকদের বোঝাতে থাকে, জল মিশিয়ে পাতলা করে নাও, নইলে সইবে না। না, কোনো দোষ হবে না, পুজো তো করা হল।

শংকরই তখন কত অন্য রকম কথা বলেছে।

হরিশরণ বলল, শংকর সব সময়ে ভ্রমণ করে, তখন ও ফিরে গিয়েছিল ওদের আদিম ইতিহাসে, আর সদ্য সদ্য দেখে এসে বর্তমান সময়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ওর শরীর, স্বাভাবিক ভাবেই এখানে থাকে, মনের ভ্রমণ করতে বাধা নেই। এমনিতে ও আমার একটা সহায়। কুয়া কাটাতে, রিং বাঁধাতে, পিরথা নালার কুণ্ডে নামার জন্যে পাথরের গায়ে সিঁড়ি কাটাতে আমি ওর হাত দিয়েই আদিবাসীদের হাতে সাত টাকা করে দিন মজুরি দিইয়েছি। ওরা দু-টাকা করে পেত। সে সব হিসাব ওই রেখেছিল।

—কী করা যায়?

—শংকর, কয়েকজনকে তো হাসপাতালে নিতে হবে। ট্রাকে তুলে নিতে পারি।

—লাভ নেই, পথেই মরে যাবে।

—কে বলল?

ছায়াটা তো গোটা পথ ঘুরছে।

—শংকর! তোমরা বাঁচো, তোমরা বাঁচো, অশান্ত আত্মা শান্ত হয়ে যাবে।

—আপনি বোঝেন না। সরকার তো চায় না আমরা বাঁচি। তাতেই কোনো সাহারা দেয় না। পূর্বপুরুষদেরও অপমান হয়ে গেল, আমরা তাদের সম্মান রাখতে পারি নি। আমরা বাঁচব কি মরব সে তো আমাদের হাতেই নেই। আর, দেখছেন না যে আশপাশ থেকে কত কম লোক এসেছে?

—হয়তো শরীরে শক্তি নেই।

—যাদের আছে, তারাও তো আসেনি।

হরিশরণ নিজেকেই বলে, ডেথ-উইশ থেকে একটা ইলাকা মরে যাবে তা আমি মেনে নিতে পারি না। মহাবীর জনসেবা একবার এল, তারপর? মাধোপুরায় ফুড কর্পোরেশনের গুদামে চাল আটা পচছে। ম্যান! কী করব আমি?

—তোমার আদিবাসী মায়লে?

হরিশরণের হাত কাজ করে, মুখ কথা বলে।

—আদিবাসী মায়লে, এম. পি, মন্ত্রী, কেউ কোনোদিন মুখ খোলে না। ওরা নির্বাচিত হলেই ওদের স্বজাতি ওদের মনে মনে দূরে ঠেলে দেয়। আর, কোনো না কোনো পার্টির মদতেই তো নির্বাচিত হয়! পার্টির ব্যাপারটাও ওদের মনে দূরত্ব আনে, ওর নিজের পার্টির সাধারণ লোকের কাছেও। তারপর বিধানসভা, রাজ্যসভা, মন্ত্রীসভা, সেখানে আদিবাসী, মেনস্ট্রীমের লোকদের মধ্যে ভীষণ একলা বোধ করে। আরে, মায়লে, এম. পি, মন্ত্রী কি! একটা সরপঞ্চ বা পঞ্চপ্রমুখও তার পঞ্চের জন্যে কিছু করতে গেলে শোনে। নিজের পঞ্চের উন্নয়ন করলে তোমাকে স্বার্থপর বলবে। ভেরি ফানি। পশ্চিমবঙ্গে কোনো আদিবাসী পঞ্চপ্রমুখের কথা বেরিয়েছিল, না কি মায়লে, সে

টাকা দেয় তার পার্টিকে আর নিজের ইলাকায় কোনো কাজ করে না।

—এটা অনেক জায়গাতেই। আবার কোথাও কোথাও মায়লে যখন একেবারে মেনস্ট্রীমের মতো, সে আমাদের মতই খচড়াই করে।

—এই সরপঞ্চের পাশাপাশি ভালপুরা দেখ। সরপঞ্চ লোকটা সেখানে চুরিও করে, কাজও করে। এর আদিবাসী পঞ্চু, টাকা বেশি, স্কীম বেশি এ কোনোটা চাইতে ভয় পায়।

—এরা ওকে ভালবাসে?

—হ্যাঁ···অন্তত বিশ্বাস পেত আগে, এবার ওর ছেলেরা লেখাপড়া করে কাজ পেল, তাতে খানিকটা দূরত্ব এসে গেছে মনে হয়। তবে ও যে আকাল দেখেও কিছু করতে পারে না, খুব অক্ষম, সে জন্যে আবার এরা খানিক একাত্ম বোধ করে হয়তো, বলা খুব কঠিন। আমার ওদের সঙ্গে সব যোগাযোগ শংকরের মাধ্যমে। শংকরকে দিয়ে কথা বলানো এমনিতেই কঠিন, আর এখন তো··

বিখিয়া এগোয়নি, খাবার নেয়নি। ও একই রকম দুর্বোধ্য চোখে পূরণের দিকে চেয়ে আছে।

—অর্ধেক লোকের যক্ষ্মা···আরে আরে!

একটি বৃদ্ধা ওদের দিকে একবার তাকাচ্ছিল, একবার হাতের বাটিতে চুমুক দিচ্ছিল। হঠাৎ ওর হাত থেকে বাটিটি পড়ে যায় এবং ও ঢলে পড়ে, ঢলে পড়ে।

পূরণ ওকে জাপটে ধরে। অদ্ভুত একটা মিশ্রিত গন্ধ. অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর, গায়ের দুর্গন্ধের, মুখের পায়োরিয়ার, ওকে আক্রমণ করে। পূরণ সযত্নে ওকে তোলে ও একটি গাছের ছায়াতে শোয়ায়।

—আমি দেখছি। আমি বৈদও আছি।

সরপঞ্চ বৃদ্ধার নাড়ি দেখে, চোখ উলটে দেখে। তারপর ধুতির খোঁটায় ফোটা ফোঁটা জল দিতে থাকে ওর গলায় এবং পুরণকে তথ্য জানায়। দাহির শাশুড়ি।

—ঢোলকি থেকে এসেছে?

—না সরকার, এখানেই আছে। একটু রিলিফ পেঁছালে আস্তে আস্তে সবাই এখানে আসবে। পিরথার উপর দিয়েই ছায়াটা ঘুরেছে বারবার, তাই না? এই বুড়িয়া!

বৃদ্ধা চোখ খোলে।

সরপঞ্চ সদয় কণ্ঠে বলে, খাও, খাইয়ে দিচ্ছি।

বৃদ্ধা কোঁচার খোঁট থেকে প্রথমে, তারপর বাটি থেকে একটু একটু করে মকাই খই চূরণ ও গুড়ের সরবত খেতে থাকে।

হরিশরণ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, কাল থেকে পাতলা ভাত, লবণ দিয়ে গলা ভাত ওদের রেঁধেই দিতে হবে। ডাল দেয়া চলবে না, পেটে সইবে না।

—স্বাস্থ্যসেবক ভেজে দিন।

—হ্যাঁ, অন্তত আন্ত্রিক বলে…কিন্তু সরকার যদি এ রকম করে…কাল আমি যদি মাধোপুরা যাই…ম্যাজিস্ট্রেট আসুক, এস. ডি. ও. আসুক…সি. এম. ও আসুক…কেউ না আসুক এফ. সি. আই. এর গুদাম থেকে দিক কিছু…

পুরণ আস্তে বলে, তুমি যেও মাধোপুরা।

—এখানে?

—আমি হাত লাগাব, হয়ে যাবে।

—ও। বৃষ্টি…একটা বৃষ্টি…হলে এখন।

—আবার একটা বৃষ্টি?

—বৃষ্টি তো চাই। তাহলে খাজড়া গাছগুলোও বাঁচে। বৃষ্টি পেলে মাটকুয়া ভরে, পিরথা কুণ্ডীতে জল ভরে…

ট্রাকের হর্ন বাজে।

—ট্রাকটাও মহেশ রোড ট্রান্সপোর্টের, এস. ডি. ও-র যোগাড় করা। কিভাবে কাজ করা যায়—যত ব্যবসাদার ব্যাপারীর সাহায্য নিয়ে—এখন অগতির গতি মহাবীর জনসেবা—

—আসবে তো বলছ।

—কী বলব বলো? তথাকথিত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। বিরাট ব্যাপার। প্রচুর টাকা পায় রাজ্য থেকে, কেন্দ্র থেকে। কৌশলজী কংগ্রেস, বি. জে. পি, লোক সেবাদল—মানে জিগ্যেস কোরো না—যত পার্টি, সব রাখে পকেটে। একমাত্র ওরা কিছু সহায়তা করলে—এদের সেবা করছে তাই বলেই তো এত টাকা আনে। কিছু কাজ যে করে না তা নয়, কিন্তু এখানে···আমাকে বলল, আপনি ভাল লোক, বলছেন, যাব। কিন্তু সরকার তো মানছে না এটা আকাল, সরকার না রুখে যায়।

—তুমি কী বললে?

—আমি বললাম, দারিদ্র্য মোচনে সরকার তো এখন স্বেচ্ছা-সেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা স্বীকার করছে। আপনি কাজ করুন। ব্লক থেকে আমি সাহায্যও করব, আর···এগুলো মিথ্যে কথা বলছি বলেই বলেছি···কিন্তু হোয়াই নট? সরকার যদি কিছু না করে আই. টি. ডি. পি. মৌজায়, আমি বললাম, ব্লক থেকে বলব যে আপনারা স্কীম করুন।

—তা কী ওরা করতে পারে?

—আরে, আর. এল. ই. জি. পি. আর এন. আর. ই. পি. করতে পারবে না. কিন্তু স্কীম অসংখ্য, টাকা অন্তহীন···কিছু না কিছু করানো যাবে নিশ্চয়।

—এর একটা নকশা আছে।

—যেমন?

—ওদের রেজিস্টার্ড সংগঠন "এখানে এই কাজ করব" বলে স্কীম দিক···ও লোক জানবে।

—বোধহয় জানে, নইলে "হ্যাঁ" বলল ? এদের বলছি না, সরপঞ্চকে সক্রিয় করে এবার দেখি আর. এল. জি. পি থেকে ওদের ঘরগুলো···সরকারি ব্যাপার ? কারা গিয়ে সূর্যচুল্লীর টুপি পরিয়েছে, মায়লে বলে, কয়েকটা সূর্যচুল্লি হোক না কেন আমার ইলাকায়। আর বায়োগ্যাস ভি কর দিয়া যায়। বলতে বাধ্য হলাম যে আমার ব্লকের সমস্যা কী রাঁধবে. কোন. চুল্লিতে রাঁধবে সেটা সমস্যা নয়। গরু-মোষ নেই যে গোবর থেকে বায়ো হবে। আর মায়লে সাহেব ! বায়োগ্যাস তো মানুষের মল থেকেও হয়। আপনার নির্বাচনী এলাকায় মানুষ খায় কম, উপোস করে, মলের পরিমাণও যৎসামান্য। তা থেকে বায়োগ্যাস করা যাবে না। এটা আমার মত, আপনি অবশ্য যা হয় করতে পারেন।

—কী বলল ?

—কিছু না। বুঝলে তো ? ওর ভাইটা মায়লে হলে বুঝানো যেত। তার বুদ্ধি খুব। এ তেমন নয়।

সরপঞ্চ এবার হ্যাজাক আনে।

—শংকর ! আমি পূরণজীকে ঘরটা দেখিয়ে আনি। চলো পূরণ ! এখন কাজ চলবে।

সামনের ঘরটির পাশ কাটিয়ে পাহাড়ের ঢালে আরেকটি ঘর। ঘরটি খুব ছোট নয়, চালের ঘাসও অপেক্ষাকৃত নতুন। হরিশরণ বলে, দাহিরা ওই জল খেয়ে যারা মরে, তাদের প্রথম ব্যাচ। ওই যে বললাম···কিছু কাজ করল···কিছু মজুরি পেল···ঘরের চাল সারিয়েছিল···কেমনভাবে ঘর তৈরি করে দেখ ! পাথর দেখেছ ?

—পাথর কেটেছে ওরাই তো ?

হ্যাঁ···ওই সরু সুড়ংগের মতো প্যাসেজের পিছনে সম্ভবত গৃহ দেবতা ও পারিবারিক দেবতার ঘর। ও ঘরে ঢুকো না কখনো।

—না।

—এ ঘরে চলবে ?

—খুব।

অন্ধকার চোখে সয়ে এলে দেখা যায় ঘরে কিছু নেই। শুধুই ঘর।

—উনোনও ভেঙে দিয়ে গেছে। দরজা ··মানে ঘাসের আগড়ও খুলে নিয়ে গেছে।

—কেন?

—এ ঘরে আর কেউ থাকবে না। কোনোদিন দাহির পরিবারের কেউ আসে, নতুন আগড় দেবে, নতুন চাল করবে। এখানে কলসি বসাতো, পাথরে গর্ত হয়েছে।

—এরা জানালা রাখে না।

—ওই যে জানালা, ঘুলঘুলি।

—খুব ভাল ঘর।

—দরজাটা গ্রামের দিকে নয়, পশ্চিমে, পাহাড় ত তার পরেই ঢাল। কেন, তা বুঝলে?

—কেন?

কবে নাগেসিয়াদের কারা আক্রমণ করেছিল, ঘর বাঁধে আজও পাহাড়ের ঢালে···

—পালামৌয়েও তাই।

পালামৌয়ে নাগেসিয়াদের ঘরে সে বছর পালামৌয়ের বিখ্যাত শীতেও পুরণ কোনো খেজুর পাতা বা ঘাসের চাটিও দেখেনি। কা কিয়া যায় মহারাজ! সব মালিকরা টেনে নিয়ে গেছে। শত্রু আক্রমণ করতে এলে দেখতে পাবে বলে বাজপাখির মতো পাহাড়ের উপর ঘর বেঁধেও পালামৌয়ের নাগেসিয়ারা দাস-মজুর বা কামিয়া, বা সেওকিয়া, বা হরোয়াহা, বা চরোয়াহা হওয়াকে ঠেকাতে পারেনি, পালাতে পারেনি কোথাও।

ওদের পালাবার আর জায়গা নেই কোথাও, পালামৌয়েও নেই।

নেংটি-সর্বস্ব তরুণ গিধারী নাগেসিয়া বলেছিল. ও কোনোদিন একটি পেট্রল লাইটার কিনবে. দেশলাইয়ের দাম অনেক বেশি। ধূমপানের জন্য নয়. উনোন ধরাবে ও শীতে হাত-পা সেঁকবে।

—দেখ পূরণ, ওদের ঘরে ঘরে ঘোরো। যে ঘরগুলো বেশি ওপরে, তার দরজা এটার পূবে তো ওটার পশ্চিমে।

পূরণ আস্তে বলে. তার কারণ. যে কোনো দিক থেকে শত্রু এলেই কোনো না কোনো ঘর থেকে দেখা যাবে. যেত। ওরা ঢোমরা বাজাত. বিহারে নাগারা বাজাত। সেই কথাটা ওরা রক্তে বহন করছে। তাই এ ভাবে আজও ঘর বানায়।

—তুমি জানো ?

—পূরণ ঈষৎ হাসে।

—কেউ বলেনি। এই ঘরটা বলে দিচ্ছে. কিংবা এ ঘরে ঢুকে আমি বুঝতে পারছি সব পরিত্যক্ত ঘরই কথা বলে। এটা রক্তজাত বোধ. পুরুষ থেকে পুরুষে এ বোধ রক্তে প্রবাহিত হয়।

—পূরণ ! রোমান্স কোরো না।

—রক্তজাত বোধ ! দেশান্তরী পাখিরা কেন শীতকালে ঠিক এক জায়গা থেকে দীর্ঘ পথ উড়ান দিয়ে ঠিক একই জায়গায় আসছে হাজার হাজার বছর ধরে ?

—ওরা কবে আক্রান্ত হয়েছিল ?

—জানি না। এই আদিবাসীরা পালামৌতেও আছে, বিহারের আদিবাসী তালিকায় নাম নেই। মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ ...

ছোট গোষ্ঠী, এ ভাবে ছড়ালো কেন ? এক জায়গায় থাকত, মানুষ বাড়লে আরেকটা গ্রাম পত্তন করত. এটাই তো স্বাভাবিক যে এক সঙ্গে থাকবে, কাছাকাছি। ছড়িয়ে পড়ল, অতদূরে গেল, আক্রমণ ঘটেছিল।

—এখন তো অন্য আক্রমণ! পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, চারদিক থেকেই আক্রমণ।

—হ্যাঁ, শংকর বলছিল।

—তোমার জলের কলসি লাগবে।

—জলের বোতল আছে।

—তেল ভরা লণ্ঠন··· মশারি··· কিন্তু শোবে কিসে? সরপঞ্চের বাড়ি থেকেই কিছু···

—আমি চেয়ে নেব।

—থাকবে···কত দিন···?

শংকর দরজায় এসে দাঁড়ায়।

—তুমি কী বলো?

—আমি কী বলব?

—ও যে ছবি এঁকেছে—

—হ্যাঁ, সেই ছবি।

হরিশরণ ওর দিকে চেয়ে থাকে।

শংকর বলে, তিন জন হাসপাতালে যাওয়া উচিত···ওরা যেতে চাইছে না।

—ভালপুরাতেও তো ছায়া দেখা গেছিল।

শংকর নিরুত্তর।

—চলুক না এখন!

—কী হবে সরকার।

হরিশরণ সারা দিনের ক্লান্তি, উদ্বেগ, পরিশ্রমে ভেঙে পড়ে। চেঁচিয়েই ও মিনতি জানায়।

—শংকর! আমি তো বন কাটিনি, তোমাদের জমি নিইনি, হালি রাখিনি তোমাদের···আমি তোমাদের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মাত্র···আমি তো কিছুই পারি না, যেটুকু পারি, সেটুকু করতে দাও, ওদের নিয়ে যাই।

শংকর বিষণ্ণ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

তারপর বলে, নিয়ে যাও সরকার! হাসপাতালে এখন বেঁচে যাবে, আবার ফিরে এসে মরে যাবে। দাদিকে গত বছর সুঁই ইলাজ করালে... এ বার তো...

হরিশরণ মুখ মোছে।

—এবার আমি যতদূর পারি... হ্যাঁ শংকর, সরপঞ্চের ঘর থেকে একটা দড়ি, একটা বালিশ...

—একটা চাটাই হলে হয়ে যাবে। বালিশ তো আমি মাথায় দিই না।

শংকর নিষ্প্রাণ গলায় বলে, দড়ি (শতরঞ্চি), গদী, চাদর, বালিশ, কিছু আনব না?

—শুধু চাটাই, যাতে মশারি গোঁজা যায়।

...সেই পত্রকার সাবও.. আদিবাসী ঘরে থাকবে বলে তাদের মতো করে থাকো তোমরা... কেন? তাহলে মশারি বা কেন, মশা তো নেই।

—আমার সাপের ভয় আছে।

—কোথায় সাপ সাহেব! সাপ তো আসে না, কোথায় গেল?

শংকর নিজেকে প্রশ্ন করে।

পূরণ বোঝে, কিছুতে ও শংকরের বিশ্বাস অর্জন করতে পারছে না। ও নীরবে ওর ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার বের করে দেয় শংকরকে।

—কেন দিচ্ছ?

—সরপঞ্চজীর ঘরে রেখে দাও।

—শংকরের চোখে যবনিকা।

—আমি ছবি তুলব না, কোনো টেপ করব না।

হরিশরণ বলে, ইউ ফুল!

—না হরিশরণ।

শংকর ওগুলো পুরণকে ফিরিয়ে দেয়।

—তোমার জিনিস তুমি রাখো· ছবি তো সেই পত্রকারও উঠালো—

হরিশরণ শুকনো গলায় বলে, আমরা সেটা প্রচার হতে দিই নি। দিলে পিরথার মানুষ ভেঙে পড়ত।

শংকর বলে, চলো সরকার। তোমাকে আগিয়ে দিই। তারপর একে চাটাই, জল এনে দেব।

—স্নান করা যায় কোথায়?

—আঁধার হয়ে গেল···সরপঞ্চের ঘরে চলো না কেন। খাবে তো ওখানেই।

—স্নান করব।

—সেখানেই তো খাবে। সাব! তোমরা কিছু বুঝ না। তুমি না খেলে কি আমাদের খিদে কমে যাবে?

হরিশরণ বলে, চলো চলো, সরপঞ্চ বলতে পারবে, চল্লিশ বছর আগে এ জায়গা কেমন ছিল।

নিচু গলায় ইংরিজিতে বলে, রাতে কেউ মরে গেলে কাল তোমাকে চলেই যেতে হবে, লোক তো মরছেই। কিন্তু এখন থেকে যা হবে, কোনো ট্রাজিডি ঘটলেই ওরা তোমার আসার ব্যাপারটাকে—

—মারবে না তো?

—না, কখনো নয়। তুমি ওদের অতিথি, চাপিয়ে দেওয়া অতিথি, তবু অতিথি।

ওরা চলতে থাকে। কঙ্কাল পুরুষ-রমণী-বালক-বালিকা এখন ওই ছবিটি দূরে রেখে বেষ্টনী রচনা করে শুয়ে পড়েছে, হ্যাজাক জ্বলছে।

সরপঞ্চ বলে, কড়াই কাল মাজাব। মাল সব তুলে দিয়েছি।

চলুন সাব, আপনিও তো ক্লান্ত।

—আপনি ক্লান্ত নন?

—আমি সরপঞ্চ…এটা আমার কাজ…আমার ক্লান্ত হলে চলে? এই ব্লক সরকার আছেন বলে একটু কাজ করতে পারছি, নইলে —

হরিশরণ বলে, আর ও কথা বলবে না সরপঞ্চ। এরপর তোমার পঞ্চে কোন আদিবাসী; কোন গরিবের ঘর নেই, আমি পুরো তালিকা চাই।

—হ্যাঁ সরকার।

—ব্লকে যেতে পারো না? হাল্লা উঠাতে পারো না? আমি যে এতবার বলছি তোমরা না আগালে আমি কাজ করতে পারি না। মাধোপুরা গেলে আজ তিন বছর শুনে আসছি. আপনি বলে যাচ্ছেন, সরপঞ্চ কি আপনাকে কিছু জানায়? আমার গালে তুমি কতবার চড় মারবে বলতে পারো?

—এমন বলবেন না সরকার।

—কাজ দেখাও, কাজ দেখাও, আই. টি. ডি. পি. মৌজায় সরপঞ্চ হবার কোনো যোগ্যতা তোমার নেই।

—এবার হয়ে যাবে।

—সবাই মরে গেলে, তবে?

—সরপঞ্চ বলে, সামনে পাথর, দেখে চলুন।

হরিশরণ বলে, পুরণ! একবার যদি ঘামানো যেত প্রশাসনকে, ম্যান! তোমার রিপোর্ট বেরোক, সুরেজের রিপোর্ট পাঠিয়ে তোমাকে যেমন আনতে পারলাম, তেমনি তোমার রিপোর্ট পাঠিয়ে দিল্লির কোনো বড় কাগজ… এই সরপঞ্চের জন্য…অন্য পঞ্চ থেকে কতবার আমার কাছে আসে আর এর কাছে আসি আমি, ও যায় না।

—এবার যেতাম…

—পূজো দিচ্ছিলে।

—দাও, পূজো দাও। কাজও দেখাও।

—সরকার, বৈদ্য কাজও তো করতে হয়।

—সমস্যা অনেক বড়ো সরপঞ্চ। তোমার আমার চিকিৎসায় সারবে না, আমরা চেষ্টা তো করব।

—অত ভেব না হরিশরণ।

—সরকার, আপনারও তো ভোজন হয়নি।

—থাক্।

শংকর বলে, আমি তোমার সঙ্গে যাব ?

—না তাহলে এদিকে দেখবে কে ?

শংকর বলে, মেঘ আসছে, চলে যাচ্ছে, আসছে, চলে যাচ্ছে। মেঘও জেনে গেছে আমরা পাপ করেছি।

তারপর নিরুত্তাপ গলায় বলে, আমরা অশৌচে আছি। তা জেনেও তো পত্রকার সাব এসে গেলেন।

নিজেকেই বলে, কৈসে রোখেঁ ? কোনোদিন তো পারলাম না আমরা। সবাই দেখতে আসে, দেখতে আসে, আমরা ময়লা হয়ে যাই। আমাদের মেয়েরা···

হরিশরণ বলে, বিক্রিও করল কজনকে, তোমার উচিত ছিল না আমাকে সেটা জানানো ?

—সরপঞ্চজীর জানাবার কথা।

—তুমি তো আমার কাছে যাও।

—এ বছর প্রথম পিরথা থেকে মানুষ বিক্রি হয়নি। আমরা যতদিন থাকব, ততদিন খরিদ্দার আসবে।

—পূরণ, পিরথাকে ম্যাপে তুলি কী করে ?

—কাল হবে, কাল। বাড়ি যাও, স্নান করো, বিশ্রাম করো, কিছু খাও।

বড়সড় চেহারার, খুবই লোমশ হরিশরণকে এখন একটি

পথহারা বিভ্রান্ত ভালুকের মতো দেখায়।

—এই অবস্থা পিরথায়, সে জন্যে লড়ে গেছি পুরণ, কিন্তু বিখিয়ার আঁকা ছবিটা ?

—উঠে পড়ো তো ট্রাকে। রোগা নিয়ে যাচ্ছ।

—পিরথা আমাকে খেয়ে নেবে।

হরিশরণ চলে যায়।

শংকর চেয়ে থাকে, মাথা নাড়ে।

সরপণ্ড বলে, কা রে শংকর, ভোজন হো যায়ে ?

—না সরপণ্ডজী। এই সাব যাবেন কী করে ?

—আমি গণেশকে দিয়ে দেব সঙ্গে।

—আচ্ছা। পত্রকার সাব ! রাতে বাইরে বেরোবেন না। ব্যাটারি থাকলেও তাল পাবেন না। সবই তো পাথর ! কোন পাথর ভাল, কোন পাথর মন্দ, তা তো বুঝবেন না। পড়ে যেতে পারেন।

সরপণ্ড বলে, হাঁ হাঁ, আগে তো পিরথার পাহাড়ের পাথর চলে বেড়াত। সব কিছুর জীবন ছিল। ঔর সুরজ দেবতা ওদের বলে দিলেন, জীবন ত থাকল, কিন্তু এখন আমি পৃথিবীতে মানুষ পাঠাচ্ছি। তারা বসতি করবে। তোমরা আশ্রয় দেবে। এখন তোমরা স্থির হয়ে থাকো। স্থির না হলে নদী নামে কেমন করে ? ঘাস আর খাজড়া বা জন্মায় কোন ফাটলে, আর বন বা কেমন করে হয় তোমাদের ঢালে, পায়ের কাছে ?

—এসব কথা কার কাছে শুনেছেন ?

—দাদা, পরদাদা তাঁদের পরদাদা। বইয়ে কী লেখা থাকে সাব ? বই যারা লেখে তারা আমাদের কাছে এসে জানতে চায় না কিছু, আর যা লেখে ··

শংকর বলে, আমি চলি সাব, সরপণ্ডজী !

শংকর চলে যায়।

সরপঞ্চ বলে, ওই সরকার শংকরকে খুব ··খাওয়ানও সামনে থেকে। বলেন, তোমার তাগদও চলে গেলে পিরথার কথা কে জানাতে আসবে? চলুন, স্নান করুন, ভোজন-সেবা করুন, আপনার কষ্ট হবে।

—না সরপঞ্চজী।

—কিছু তো মিলে না।

—কিছু চাই না।

খরা চলছিল তখন খরা। আচ্ছা, ১৯০০ ও ১৯০১-তে খরা ছিল, ১৯০২ অবধি, তবু ১৯০৩-১৯০৪-তে? সবুজ বিপ্লব এসেছিল? সে বিপ্লবের ফসল কারা কুড়োল? গামছা পরে কুয়োর ধারে স্নান করে পূরণ। না, পিরথা এসে ঝটপট ফিরে গিয়ে কোনো বাংলোতে সুখাদ্য সন্ধানী হওয়া ঠিক নয়, অনৈতিক।

সরপঞ্চের বউ বা পুত্রবধূ খুরো লাগানো পিঁড়ি পেতে দেয় এবং থালা সাজিয়ে আনে।

রুটি, ভাত, ডাল, আচার, পাঁপড়, দই।

পূরণের ভিতর থেকে কী ঠেলে উঠে আসে। চারদিকে অনেক "এক বাচ্চা, বাস্" লেখা ও সুখী দম্পতীর ছবি ছাপা পোস্টার। যে দেশে প্রতি দেড় সেকেন্ডে একটি শিশু জন্মায় সে দেশে এ পোস্টার ব্যর্থ হয়েছে।

—সরপঞ্চজী, আমি এত খেতে পারব না।

সাজানো থালা যে এমন ভাবে ধাক্কা দিতে পারে তা পূরণ আগে জানেনি।

—আরেকটা থালা আনতে বলুন।

আরেকটা থালা আনে মেয়েটি।

—নিরামিষ ভোজন, শাকাহারী!

—না, ভাল লাগছে না।

—দুপুরে একটু ছাতুর শরবত খেলে···আমি তো ওই চূরণ

আর গুড়ের গোলা খেয়ে নিয়েছিলাম · কিছু খান নি, পিত্তি পড়ে গেছে। খান, আপনার যা ইচ্ছে হয়।

একটু ভাত, একটু দই, একটু গুড়।

—ব্যস? আর কিছু নেবেন না?

—না পারব না।

—কাল খাবেন তবে।

—না, খেতে আসব না। আপনি আমাকে কিছু ছাতু, লবণ, গুড় আর চাল কিনিয়ে দেবেন। একটা বাসন।

—আপনি নিজে বানিয়ে খাবেন?

—হ্যাঁ, আমার অভ্যেস আছে।

—সাবের বাড়িতে সবাই আছেন?

—মা, আমার মা, আর আমার ছেলে।

—ঘরওয়ালী?

—মারা গেছেন।

—আর সাদীও করেননি। ছেলে··· ?

—তার দাদী আছে। বড়ও হয়ে গেছে।

হাসতে চেষ্টা করে পূরণ, ওই পোস্টারের মতো আমরাও একটাই ছেলে।

—হ্যাঁ দেয়ালে লাগালে ফুটোফাটা আটকায়, মেঝেতে পাতলে ঠান্ডা আটকায়, আমি তো খুব বিলাই। তবে এক বাচ্চা ব্যস্। এটা আপনারা অবিচার করেন। আপনাদের ঘরে তো চারটে বাচ্চা থাকলেও তারা খেতে পায়, লেখাপড়া শেখে। গরিবের মধ্যে তা কি চলে? যত সন্তান থাকে, তত ভাল।

—খেতে তো দিতে পারবে না।

সরপঞ্চ হাসে পূরণের অজ্ঞতা দেখে।

—সে তো নিজের কোদো নিজে জোগাড় করে নেয়। কেউ বনে গেল কাঠ আনতে, কেউ গাঁয়ের পাঁচজনের বা দূর গাঁয়ে

কোনো গৃহস্থের ছাগল চরাই করল, কেউ ছোটভাই-বোনকেও সামলাল, আবার রান্নাও করল। মা-বাবা গেল কাজের খোঁজে ভালপুরা। কেউ জল আনল, কেউ কাঠ বেচতে গেল হাটে। আর খাজরা পাতার চাটিও সবাই বুনে, হাটে বেচে।

অকাট্য যুক্তি।

—ওই পরিবার পরিকল্পনা গরিব ইলাকায় চলে না। গরিব ঘরে অনেক ছেলে মেয়ে দরকার।

এবং তাদের শৈশব থাকে না, তারা থাকে নিরক্ষর। ভারতে প্রতি দেড় সেকেণ্ডে একটি শিশু জন্মায়। যেখানে বাপ মা এক ঔর দো বাচ্চা, বাস্ করে বসে আছে, সেখানে শিশুর থাকে খেলনা ও খাদ্য সারপ্লাস শৈশব। তারপর নার্সারি থেকে যতদূর সম্ভব উচ্চশিক্ষা। সমাজের যে স্তর গরিব, সে স্তরে জনসংখ্যা বাড়বে, বাড়ছে। ভারতবর্ষ ১৯০১ সালে তাদের মাথা গুনবে এইমাত্র। আর দেবে না কিছু, শিক্ষা, বাঁচার সুযোগ, মানুষ হবার উপায়। স্ত্রী-সঙ্গমই সে স্তরে একমাত্র সুখ, ভেতরে জমে থাকা ব্যর্থতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উপায়, এবং বাপ মা যতদিন দারিদ্র্য-সীমার অনেক নিচে, ততদিন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় থাকলেও বর্ষে বর্ষে দলে দলে শিশুরা হয়ে যাবে শিশু শ্রমিক, উপার্জনের সহায়। পালামৌয়ে পূরণ তো আট দশ বছরের বালক বালিকাকেও দাস-মজুর বাপ মার সঙ্গে মালিকের খেতে কাজ করতে দেখেছে।

উঠে পড়ে পূরণ।

—এ গণেশ!

—জী!

—সাবকে গদী-বালিশ-চাদর-দড়ি…

—শুধু একটা চাটি দিন।

—এক বাণ্ডিল পোস্টার নিয়ে যান, পেতে নেবেন। সরপঞ্চের চোখে যেন ঈষৎ করুণা। পূরণ বোঝে, ও হয়তো বোকামি

করছে। ব্যাগে লুঙ্গি ও দাঁতের মাজন গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, অতএব সে খুব স্বাবলম্বী বলে নিজের বিশ্বাস ছিল।

এখন দেখছে তা যথেষ্ট নয়। নিজেকে খুব আধা-মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এটা সত্যি যে ও কম খেলে বা চাটিতে শুলে শংকরদের কাছে পেঁছানো যাবে না। পুরণদের ও শংকরদের মধ্যে ব্যবধান অনন্ত। কিন্তু ও তো চায় কাছে যেতে।

সরস্বতী বলে, কোনোদিন দেখবে তুমি যা জান তা যথেষ্ট নয়। সেদিন হয়ত অহমিকা কাটবে, স্বাভাবিক হবে।

—আমি কি অহমিকায় পূর্ণ ?

—ওই যে 'অহমিকা নেই' সেই অহমিকা ? আছে. তোমার একরকম, আমার একরকম, সময়ের প্রভাব এড়াব কেমন করে আমরা ?

এখন পুরণ বোঝে, ঠিক এমন পরিস্থিতিতে ও কখনো পড়েনি আগে। যেখানে পূর্বপুরুষদের আত্মা ছায়া ফেলে ঘোরে, বিখিয়া ছবি আঁকে, জনপদ মৃতাশৌচে অশুচি হয়ে থাকে এবং শংকর হাজার বছরের ওপার থেকে বলে, "আমরা ছিলাম!" এ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে থাকে দুর্ভিক্ষ, মানবসৃষ্ট। একই মানুষ, একই সঙ্গে, সংবিধানে ও ঘোষণায় গরিবি হটায়. দুর্ভিক্ষ তৈরি করে. আর্ট ফিল্মে প্রতিবাদী হয়।

চকচকে পত্রিকায় সমাজের উপর মহলের সেবা করে, এমন কত জগাখিচুড়ি।

পুরণ কী করবে ?

ফেরার সময়ে বোঝা ভারি হয়। সরপঞ্চ ছাতু, গুড় ও লবণ চাপিয়ে দেয়, কিছু চাল। গণেশ একটি কড়াই নেয়। সরপঞ্চ বলে, দাম নেব না এখন।

—আমার কাগজ তো টাকা দিয়েছে।

—কাল হিসাব করে টাকা নেব।

ফেরার সময়ে গাবাহি থেকে পিরথার পথ খুব বেড়ে যায়। সময় লাগে পেঁছিতে।

পিরথা নিঝুম। বিখিয়া ছবিটির সামনে ঘুমোচ্ছে।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠন জেলেই গণেশকে বিদায়। চাটি পেতে মশারি টাঙিয়ে মশারি গুঁজে শুতে শুতেই ভীষণ ঘুম পেয়ে বসেছিল পূরণকে।

রাতে বৃষ্টি এসেছিল ঠান্ডা বাতাসে সওয়ার হয়ে।

আর বৃষ্টির আবহসংগীত যখন তুঙ্গে, তখন পূরণের ঘরে ঢুকেছিল খানিক ভেসে, খানিক নখ আঁচড়ে, শংকরদের পূর্ব-পুরুষদের আত্মা।

প্যাসেজ পেরিয়ে সে ঢুকে গিয়েছিল মৃত দাহির গৃহদেবতার গর্ভগৃহে। সংকীর্ণ প্যাসেজ দিয়ে ডানা মুড়ে, নখ ঘষে ঘষে। তারপর সে কি কোনো শব্দ করেছিল ?

পূরণ তা বলতে পারে না।

পূরণ পাথর হয়ে যায়। হিম হিম।

বৃষ্টি পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে।

গর্ভগৃহ থেকে কি নিশ্বাসের শব্দ এসেছিল ? টর্চ ফেলে দেখবে ? না, তা হতে পারে না। আস্তে আস্তে পূরণ ওর অসাড় নিস্পন্দ দেহকে সচল করে, ওঠে।

বিছানা থেকে বেরিয়ে দাঁড়ায় মেঝেতে। তারপর আস্তে এগিয়ে যায় প্যাসেজটির দিকে। প্যাসেজের শেষে আরেকটি ঘর। ঘরের ঘাসের চাল খানিক উড়ে গেছে। ঘরটি খুব বড় নয়। বৃষ্টির মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক। চোখ সয়ে আসে। ঘরের মেঝে জুড়ে বসে থাকা এক আঁধার শরীর।

কোটি কোটি বছরের ওপার থেকে শংকরদের পূর্বপুরুষদের আত্মা পূরণের দিকে তাকায়, সে চাহনি এতই প্রাগৈতিহাসিক, যে পূরণের মস্তিষ্কের কোষগুলি শত অ্যান্টেনা ছড়িয়েও কিছুই

বোঝে না সে চাহনির। আজ রাতে সে যদি দেখত যে কোনো পাথর ডানা মেলে উড়ছে, তার সঙ্গেই কি পূরণ কথা বলতে পারত?

প্রাণীটির নিশ্বাস পড়ছে, শরীর কাঁপছে। পূরণ ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসে।

বেরিয়ে আসে বাইরে। বৃষ্টি ওকে ভিজিয়ে দেয়। পূরণ আকাশপানে মুখ তুলে হাঁ করে থাকে। বৃষ্টিধারা ও কখনো পান করেনি। এখন ওর চোখ দিয়ে জল পড়ে, পাথরে বসে পড়ে পূরণ। মাথা হেলায় দেয়ালে।

না, বলা যাবে না। ও পূরণের শরণার্থী। পূরণ কোনো কারণেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা পূরণের আছে?

শংকরদের পূর্বপুরুষরা পূরণকে কেন শক্তি দেবে? অতীত থেকে আজ, আর্য ও অনার্যদের, জীবিত ও মৃতদের চলার দীর্ঘ পথ তো সমান্তরাল।

পূরণ নিজের পূর্বপুরুষদের বিষয়ে (ব্যক্তি পূরণের নয়) কোনোদিনই অনুসন্ধিৎসু ছিল না এবং সরস্বতীর সেদিনের ব্যক্তিগত মন্তব্য (সরস্বতীর বন্ধুর বোন স্বামী কর্তৃক দহেজ কারণে নিহত হবার পর), দেখ! রামচন্দ্র বিহারের বর্ণহিন্দু পুরুষদের আদর্শ। কী তিনি করেননি? রাজনীতিতে বেইমানি, প্রবলকে ষড়যন্ত্রে নিহত করে দুর্বলকে হাত করে রাজনীতিক ফায়দা উঠানো, বউকে পুড়িয়ে মারা, গর্ভাবস্থায় ত্যাগ করা, শূদ্র তপস্বী শম্বুককে হত্যা করা,—আমার মনে হয় না বিহারে উচ্চবর্ণের পুরুষরা রামের প্রভাব কাটাতে পারবে কোনোদিন।

এ মন্তব্য পূরণকে আরো সংশয়ে ফেলে দিয়েছে। না, সে পূর্বপুরুষদের কথা জানতে চায় না।

কে ওকে এই মুহূর্তে শক্তি দেবে? পূরণ দেখে আকাশ পাতলা হচ্ছে এবং সম্ভবত ভোর হচ্ছে।

ও কি ঘোরের মধ্যে ছিল, যাকে বলে ট্রান্স? কিন্তু এখন তো সময় খুব কম। যা হয় কোনো ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু কী করবে? উলঙ্গ ভিখারিকে কোহিনুর লুকোতে বললে সে কোথায় গোপন করে অমূল্য রত্ন?

কোহিনুর নয়, তার চেয়ে অনেক দামি, দুষ্প্রাপ্য, সমস্ত পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেবার মতো খবর।

পিরথার আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দুনিয়ার সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, আসছে, আসছে। মাধোপুরা কেন, পিরথা পৃথিবীর ম্যাপে। "হোয়াই ও হাউ" নিরূপণ করতে বিখ্যাত সব ফাউণ্ডেশন শেষ অবধি যদি এই সিদ্ধান্তে পেঁছয় দুনিয়া, যে "একমাত্র উপবাসী, জীবন্ত নরকঙ্কাল অধ্যুষিত আদিবাসী এলাকাই অসম্ভবের আবিষ্কার করতে পারে। পৃথিবীর বয়স নিরূপণে সঠিক সাহায্য করতে পারে এবং প্রমাণ করতে পারে, যে এখনো ভারতবর্ষে কোনো কোনো জায়গায় আদি পৃথিবীর এক টুকরো থেকে গেছে অনাবিষ্কৃত?"

বিখিয়া আন্তর্জাতিক দূরদর্শনে?

পূরণ মাথা নাড়ে। ঘরের পিছনে চলে যায়। খুঁজতে থাকে। ঘুরতে থাকে।

কে ওর হাত ধরে।

বিখিয়া।

বিখিয়ার চোখে খুবই সম্রাটের মতো হাসি। মুখ নড়ে না, কথা বলে না।

পূরণ এক গোছা লম্বা ঘাস ছেঁড়ে ও হাত ছড়িয়ে দেখায় এত চাই। বিখিয়া যে শুনতে পায়, তা ও জানে। কথা তো ও ছবি এঁকে তবে বন্ধ করেছে।

—ঘাস চাই, অনেক।

বিখিয়া দাঁড়িয়ে থাকে।

—আর, এমন এক পাত্র জল!

বিখিয়া ওর হাত ছেড়ে পা ধরে, পায়ে মাথা রাখে।

পূরণ ওকে টেনে তোলে।

—ঘরে গিয়েছিলি?

বিখিয়া মাথা হেলায়।

পূরণকে অবাক করে ও ঠোঁটে হাত রাখে, নিজের, পূরণের।

—কেউ যেন না জানে! জানবে না।

বিখিয়া ঘাসের পাঁজা এনেছিল। গর্ভগৃহের প্যাসেজের মুখে ঘাস চাপাবার আগে পূরণ দেখেছিল কিছু ফুল, কিছু চাল, কিছু কোদো।

দেখেছিল এক পাত্র জল। মাটির গামলায়। চোখ বুজে বিখিয়া এগিয়ে গিয়েছিল, জলপাত্র নিয়ে এবং রেখে চলে এসেছিল!

ওদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন চোখ আধো মেলে ওদের দেখছিল আর তখন পূরণ দেখে তার দেহটি তিরতির করে কাঁপছে। না, খুব বড় নয়। এবং বিবর্ণ চোখে ওটা কী, জিজ্ঞাসা? ব্যাকুলতা? কী হতে পারে?

ঘাসের বোঝা ও-ঘরেও নিয়ে যায় বিখিয়া, এক কোণে রাখে। ওর হাতে পায়ে এখন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা।

তারপর হাত-জোড় করে মাথা নিচু করে ও এক পাক ঘোরে। লম্বা হয়ে সাষ্টাঙ্গে জানায় প্রণাম। ওপর পানে চায়, ঝড়ে চাল উড়ে গেছে, ওপরটা ফাঁক।

প্যাসেজের মুখে ঘাস চাপা দেয়। এত শুকনো ঘাস কি ওর ঘরে টাল করা ছিল? ওই মাটির পাত্র, ও কি ঘর গৃহস্থালীর, যে ঘর ছেড়ে মানুষরা চলে গেছে মৃত্যুর

হাত ধরে ?

পূরণ ওর দিকে চেয়ে থাকে। যাক, এখন শুধু ও একা নয়, বিখিয়া ওর বিস্ফোরক আবিষ্কারের দুঃসহ বোঝার এক ভাগীদার। মস্তিষ্কের কোষে এ অভিজ্ঞতা বহন করতে গেলে পূরণ পাগল হয়ে যেত।

বিখিয়া পেয়েছে ওর পূর্বপুরুষের আত্মাকে। তাই ওর মুখে চোখে এখন স্থির প্রাজ্ঞতা।

পূরণ কী পেয়েছে ?

বিখিয়া পূরণের হাত সযত্নে ধরে। পূরণ কাঁদে নীরবে।

বিখিয়া ওকে টানতে থাকে বাইরে ও আঙুল দিয়ে দেখায় সামনে।

পাথরের ফাঁকে জল নামছে ঝরঝর।

বিখিয়া কি ওকে জলের সংগীত শুনতে বলছে ? বিখিয়া ওর দিকে চেয়ে থাকে গভীর প্রত্যাশায় এবং পূরণ কিছুই বোঝে না।

পরে পূরণ বুঝেছিল, কিছুক্ষণ পরে। যখন শংকর এসে ওকে নিয়ে যায় নিচে।

—কোথায় ?

শংকর জবাব দেয়নি। পিরথা নালার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, তুমি এই বৃষ্টি এনেছ, তোমার কাছে পিরথার মানুষরা এখন ঋণী হয়ে গেল।

ঝরঝর জল গমগমিয়ে কুণ্ডে পড়ছে। চলে যাচ্ছে, সেদিকে চেয়ে পূরণ আস্তে বলেছিল, ব্লক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করো শংকর। উনি খুব সৎ মানুষ।

—জানি না, অভিশাপ কেটে যাবে কি না।

—যাবে হয়ত।

শংকর নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, এমন সময়ে জল দিল দেবতা, যে আমাদের ক্ষমতা নেই খেতে নেমে যাই। কুয়াতে জল হয়েছে

আর খাজড়া গাছগুলো বেঁচে যাবে।

ওরা জল দেখছিল। পিরথা নালা বেরিয়ে আসছে গুহা থেকে, পাথর বেয়ে নামছে। পিরথা পাহাড়ে অনেক গুহা, ছোট বড়ো।

গুহা, গুহাচিত্র, বিখিয়ার ছবি।

পূরণ এই সময়ে বোঝে যে তার আসার রাতে বৃষ্টিপাত, আর একটা কিংবদন্তীর জন্ম দিতে পারে।

মাথা নাড়ে সে বারবার। শংকরকে বলে, মাথা ভার হয়ে আছে, জলে ভিজলাম ইচ্ছা করে।

শংকর নিশ্বাস ফেলে।

—চলো গাবহি, চা পিও।

পূরণ "না" বলে না।

তিন

হরিশরণ বলে, ম্যান, ওরা মির‍্যাক্‌লের জন্য প্রতীক্ষা করে চলে। আধুনিক যুগ ওদের কিছুই দেয়নি, মির‍্যাক্‌ল যদি ওদের এ দুঃসহ অস্তিত্বে কোনো শুভ আনতে পারে! ছোট মির‍্যাক্‌ল, বড় কিছু! পূর্বপুরুষের ছায়াটা ওদের কাছে এক রকম সংবাদ এনেছে, যার ফলে গ্রাম-কে-গ্রাম ডেথ উইশের কাছে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। অনাহার, অনশন এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে, তিন বছরে একবারও এবারকার মতো হতাশা, এমন নিঃশেষ হতাশা দেখিনি। আমি পরশু ঘুমোতে পারিনি, খেতে পারিনি, কি দুঃস্বপ্নের রাত!

— হ্যাঁ, তুমি খুব চিন্তিত ছিলে।

—টেনশান আমার পক্ষে…বাবা তো হাইপ্রেসারেই…বউ আমাকে বেঞ্জামিনের "এভরিবডি'জ নেচার কিওর" কিনে দিয়ে গেছে। সবসময়ে লেখে, ব্লাডপ্রেসারের নিয়ম মানছ তো? আমিও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে লিখি।

—নেচার কিওর কী বলে ?

প্রকৃতি কী বলে, কী সংবাদ জানায়, তা জানা পুরণের পক্ষে বেজায় জরুরি এখন। ও তো খাজড়া গাছের পাতায়, ঘাসে, পাথরে হাত বুলাচ্ছে। কোনো সংবাহন তৈরি হয় কিনা, কোনো মতে প্রকৃতির আদিম রহস্য জানা যায় কিনা, সে জন্যে ওর বড় আকুলতা সেই সঘন গগন বর্ষার রাত থেকে। কিন্তু সবই অদৃশ্য কাচের দেয়ালে মাথা ঠোকা।

শুধু রাতে বিখিয়া যখন আসে···

—আরে, আমার পক্ষে কি সম্ভব ? তবু লিখি, ফল খাচ্ছি, মাঝে মাঝে উপোস করছি, সিগারেট বা মদ অবশ্য সত্যিই খাই না। লিখি, গরগরে রান্না খাচ্ছি না, মিষ্টি খাই না, চা কফি বলতে গেলে খাই না। কিন্তু সবই তো মিথ্যে কথা ভাই। সব সময়ে কি ও-সব মানা চলে ?

—না, তা কি হয় ?

—ওঃ, তোমার কাছে আমি খুব ঋণী হয়ে থাকলাম। জানো না বোধহয়, তুমি এনেছ একটা ছোট মির‍্যাক্‌ল। ওই যে তুমি এলে, আর বৃষ্টি এল···কালও খানিক বৃষ্টি হল·· আজও হতে পারে···

গভীর বেদনায় পুরণ বলে, আমি কেমন করে বৃষ্টি আনতে পারি ? কেউ কি পারে ?

—ম্যান ! যাদের কিছু নেই, তাদের তো মির‍্যাক্‌ল দরকার। এখনকার মতো তোমাকে দিয়েই···এখন তো মুখে মুখে গল্পও সৃষ্টি হবে, গল্পটা গান হয়ে যাবে·· সে গান ঢুকে যাবে ওদের মুখের গান কাহিনীতে ধরে রাখা ইতিহাসে।

ম্লান হাসে পুরণ, তা কি হয় ?

কোনোদিন কি ওরা পুরণ আবার আসুক বলে মৌন অপেক্ষা করবে পাহাড় শিখরে দাঁড়িয়ে ? শংকর বলেছে ওগুলো পাথর

নয়। অতীতে যে সব মানুষ যুদ্ধ করতে গিয়েছিল (কোন যুদ্ধ, কার সঙ্গে, কবে, তা শংকর জানে না) শত্রুর সঙ্গে, সবাই তো ফেরে নি। যারা ফেরে নি তাদের মা, বউ, বোন পথের পানে চেয়ে চেয়ে পাথর হয়ে গেছে। তখন শত্রু আসতে পারত না ভালপুরা পেরিয়ে, আর পিরথাও ছিল বড় নদী। শংকরদের সেই পূর্ব-পুরুষরা ওই ভালপুরার কাছে গিয়ে যুদ্ধ করত, শত্রুকে ঢুকতে দিত না আদিবাসী জনপদে। কিন্তু সেখানে এখন ব্রিজ হয়ে গেছে, মানচিত্র বদলে গেছে। ওদের পূর্বপুরুষদের আত্মা সেই জন্যই কোথায় চেনা জায়গা, তাও খুঁজে ফিরেছে আর বেদনার্ত হয়েছে।

এসব কথা শংকর কত স্বাভাবিক ভাবে বলতে পারে! এমন যদি হত যে পিরথা পর্যন্ত শহর চলে এসেছে, আদিবাসীরা অ-আদিবাসীদের সঙ্গে বসবাস করছে দু-তিন পুরুষ, তাহলে হয়ত মন থেকে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যেত পূর্বস্মৃতি, অতীতের গৌরব গাথা।

পিরথাতে তো তা হয়নি। এরা একেবারে নির্বাসিত। আধুনিক ভারতের কাছে পায়নি কিছু। ওই মেটাল রোড ওদের কাছে আসে ঋণের কারণে যে শস্য কেড়ে নেবে, ভালপুরা ও রাজোরার সেই মহাজনদের, অনশনক্লিষ্ট বাপ মা চূড়ান্ত হতাশায় ছেলে মেয়ে কখন বেচবে সেই মরা, পশু খাবার লগ্নের জন্য অপেক্ষমান শকুনদের মতো ধৈর্যশীল খরিদ্দারদের, "রোজ দশ টাকা পাবে আর ভরপেট খাবার" বলে লোভ দেখিয়ে যারা দাস-মজুর করবে আদিবাসীদের, সেই লেবার-ঠিকাদারের দালালদের হয়ে।

আধুনিক ভারত ওদের শুধু পরিবার-পরিকল্পনার পোস্টার দেয়। সন্তান জন্ম তো অনাহারের কারণে কমে না, বাড়ে, যতদিন না পুরুষ ও রমণীটির দেহই ধর্মঘট করে পাকাপাকি।

কয়েকটি গ্রামের মধ্যে সাক্ষর একা শংকর। ওরও তো ওই

পাথুরে জমি চাষ, পাহাড়ের গায়ে বাস, খাজড়ার কন্দই মূল আহার্য। কেমন করে ও অতীতকে ছাড়বে? যে অতীত কিংবদন্তী না ইতিহাস তা ওরাও জানে না, কোনো গবেষকও ইতিহাস ও কিংবদন্তীকে বাছাই করতে আসে না। আর, কোনটা ইতিহাস কোনটা কিংবদন্তী, এমন চূড়ান্ত ভাবে খারিজ হওয়া আদিবাসীদের প্রেক্ষিতে তাই বা কে বলবে? ইতিহাস ও গল্পকথায় সীমারেখা কোথায়? রামায়ণ ও মহাভারত থেকে যদি এত ইতিহাস মেলে, শংকরের অতীতচারণ কোন দোষে দোষী?

এত খারিজ, এত বিস্মৃত এ সব মানুষ! সিনেমা দেখেনি, প্যাণ্ট পরে না, চা খায় না, বড় বা ছোট মির‍্যাক্‌লের জন্যে অপেক্ষা করে শুধু। পূরণ চলে গেলে ওরা কি নিদারুণ বৈশাখে অপেক্ষা করবে সেই মানুষটার জন্যে, যে না কি বৃষ্টি এনেছিল? আর, পূরণ না এলে কি ওরা আত্মসান্ত্বনার জন্যেই বলবে, হয়ত অন্য কোথাও গেছে বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে, সেখানেও হয়ত এমনই খরা! পূরণ কি এত ভাগ্যবান, যে "একদিন সে এসেছিল আমাদের দুঃখের শুকনো জ্বলে যাওয়া দিনে বৃষ্টির মেঘ সঙ্গে নিয়ে, আমরা যখন অশৌচে ছিলাম," এ কথা বলে ওরা পূরণকেও মিশিয়ে নেবে ওদের ইতিহাসে?

—কী ভাবছ পূরণ?

—না···কত কথা···তোমার কৌশলজী কিছু সাড়া দিল? এখন তিনিই তো ভরসা।

—হ্যাঁ, আজই তো গাবহিতে স্বাস্থ্যশিবির হচ্ছে। ওরা খুব সংগঠিত। কৌশলজী তো কতবার বিদেশ ঘুরেছে। দেখছ না লোক বাড়ছে কত।

—কিন্তু হরিশরণ! এটা তো পিরথার সমাধান নয়। এরা যাতে স্থায়ী সাহারা পায়···

—ভাই! যা হবে এই এস. ডি. ও. থাকতে। আজ উনিও

আসবেন। আচ্ছা, সরপঞ্চ কী বলল? তুমি না কি ওর বাড়িতে খাচ্ছ না?

—না··পিরথায় থাকব, ওর বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসব···তা পারা যায় না।

—কী খাচ্ছ?

—ওঁর কাছে চাল, ছাতু, লবণ, গুড়, কিনে নিয়েছি। ঘরে রেঁধে নিচ্ছি।

—তা অবশ্য···

—চলো, কাজ করা যাক।

—নোট নিচ্ছ?

—হ্যাঁ, লিখেই নিচ্ছি। কঙ্কালসার মানুষের ছবি তোলা যে কত বড় অসভ্যতা, তাও বুঝছি।

দয়া করে ওটি কোরো না। পিরথা বিষয়ে একটা হাল্লা হোক। নইলে আমার পক্ষে কিছু করা খুব···

—সব করে দেব ভাই। তুমি ভেবো না। আরওয়ালের পর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার টীমই তো তদন্ত করাচ্ছে, দিল্লির কত রিপোর্টার, কলকাতার বড় বড় কাগজের লোকও পাটনায় আছে। আমি পাটনার প্রেসকে জানাব। দিল্লিতেও জানাব। সাংবাদিকরা ওড়িশার কালাহাণ্ডি নিয়ে লিখছে, পিরথা নিয়ে লিখবে না? ওরা তো ভূপালে গিয়ে প্রশ্নও করবে।

—ভূপাল! ইউনিয়ান কার্বাইডও হয়, ভারতভবন তো কত বড় সংস্কৃতি কেন্দ্র, আবার মন্ত্রীও প্রাসাদ তোলে। অত বড় গ্যাস দুর্ঘটনায় রাজ্য সরকারকে ঘামানো গেল না, পিরথার বিষয়ে কি ঘামবে?

—দেখাই যাক। শুধু একটা অনুরোধ···

—কী?

—বিখিয়ার ওই ছবিটা যেন ওরা না দেখে। ওই পূর্ব-পুরুষের আত্মা···এসব যেন না শোনে। ওদের আটকে রেখো এই চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের মধ্যে। নইলে একেবারে অন্য দিকে চলে যাবে ওদের আগ্রহ। বিখিয়া হবে আলোচনার কেন্দ্র. তুমি তো তা চাও না?

—না। তা চাই না।

এই অবস্থাই তো যথেষ্ট। ওটা হজম করতে পারবে না। একটা অ্যাটম বোমা ফাটবে সংবাদের।

—জানি। ছবিটার ব্যাখ্যা কী হবে?

—ছেলেটা জাত শিল্পী। ছবি দেখেছিল কোথাও, এঁকেছিল। গুহাচিত্রও ওরই আঁকা বলে মনে করি।

—ওটা ব্যাখ্যা নয়। তবু ও প্রসঙ্গ থাক।

—এখানে স্থায়ী সমাধান চাই। ব্লক অফিসার, তোমার হাতে কিছু স্কীম নেই?

—সমস্যা বড় ঘোরালো হে পূরণ। এ ভাবে দেখ। ওদের আমি কৃষিতে সহায়তা করতে পারি। মানে, আমার ক্ষমতা আছে। কথাগুলো আজ শংকরের সামনেই বলব। তুমি জবাব পেয়ে যাবে। আর কথা নয়, চলো। এখন কাজকর্ম দেখা যাক।

ত্রাণশিবির. এই অস্থায়ী ত্রাণশিবিরও সরে গেছে পিরথা থেকে। গাবহি তবু সমতল, এবং ট্রাক আসতে পারে। কাল পিরথায় সারাদিন ভাত রান্না হয়েছে, দুধ গোলা হয়েছে জলে। এখনো পাথরের উনোনে ছাই, পোড়া কাঠের গুঁড়ি পড়ে আছে। সেখানে ঘুরছে একটি শীর্ণ কুকুর।

—বিখিয়াকে দেখছি না?

—আছে কোথাও।

—আজও পূজা হয়েছে দেখছি।

পাথর খোদাই ছবিটি এঁকেছে বিখিয়া, যেমন ছোট ছেনি

বাটালিতে শিল-নড়া কাটে, তেমন কোনো যন্ত্রে, এবং রেখাগুলি তেমনই দেখায় ছোট ছোট ঘা মেরেছে।

—আগে চকে এঁকেছিল?

—হ্যাঁ, তার ছবিই সুরজ তোলে।

—সুরজের ফিল্ম যে তোমরা কেড়ে নিলে…

—তা ও প্রমাণ করতে পারবে না। এবং এই ছবিই তো একমাত্র প্রমাণ, এটা ঢেকে…দেখা যাক।

—ছেনি বাটালি ও পেল কোথায়?

—ম্যান। ওরা ঘরের ভিতে ছবি আঁকে ওই খোদাই করেই। সেসব ওরা জানে। পাথর কেটে যে ঘাট বানাল, তাও ওরা এ ভাবেই খোদাই করে করে নিয়েছে, পা যাতে না পিছলায়। এ কাজটা ওরা জানে।

—সেটা খুব বিস্ময়। এ ব্যাপারটাকে উৎসাহ দিয়ে কিছু করানো যায় না?

—ভেবেছিলাম। এ স্কীম সরকারকে খাওয়ানো যাবে না। কতজন করবে? বাজার কোথায়? তবু মাথায় রাখলাম।

হ্যাঁ, এটা ভাবার কথা, যে ওরা ছেনি বাটালির এ ব্যবহারটা জানে, তবে এ থেকে কোনো কুটিরশিল্প গড়ে তোলা যায় কি না, ভাবি, ভাবি।

পিরথা থেকে গাবাহির পথে বাবলা গাছ অনেক। হরিশরণ বলল, আমার সামাজিক-বনসৃজন বাওলা গাছেই। পিরথা নালার এ ধার, ও ধার। ওরাই লাগাচ্ছে. আগে লাগাত না। লাগাবার ব্যাপারটা বুঝে গেছে এখন। বাওলা থেকে জ্বালানী মেলে। কচি পাতা ছাগল খেতে পারে. যদিও এখন কোনো গ্রামে ছাগল মুরগি দেখবে না। আর বাওলার যে ছড় নামে ফলের, তার দানা ওরা খায়। বাওলা এখানে কল্পবৃক্ষ। এখানে, রাজস্থানে, বাওলাই হল কল্পবৃক্ষ।

গার্বাহতে সরপঞ্চ বলে, আসুন সাব! আপনি তো এখন আমাদের কাছে দেওতা। আপনি এলেন, জল নামল।

—জল না নামলে দানো বনে যেতাম তো!

—এরা খরা চললে, আন্ত্রিকে মরলে ডাইনি খোঁজে না? এ সব কারণেই ডাইনি হত্যা হয়।

—তোমার হোমওয়ার্ক ঠিক নয়। এ সব কারণেও ডাইনি হত্যা হয়। আজকাল বেশিটা হচ্ছে জমির ব্যাপার। জমি-জরিমানা এ-সব স্বার্থ বেড়ে উঠেছে।

—এদের ডাইনি বিশ্বাস নেই?

—বিশ্বাস আছে, কিন্তু বছর বছর যদি এ হাল চলে,—ডাইনি মারলে যে বাঁচার সাহারা মিলবে না তা ওরা জেনে গেছে। কিন্তু মির‍্যাক্‌লের কথাটা ভুলো না। ওরা ধরে নিয়েছে, কিছুই ওদের প্রাপ্য নয়, এমন কি বৃষ্টিও।

—মির‍্যাক্‌ল হওয়া বড় দায়িত্বের কাজ হরিশরণ। আজকের ম্যাজিকম্যান কালকের প্রতারক।

—কঠিন কথা বোলো না পূরণ। আমার মাথা খারাপ কোরো না। শংকর! এই শংকর!

শংকর এগিয়ে আসে না। দেয়ালে পিঠ রেখে ও দেখছে। একটু এগিয়ে কৌশলজীর ত্রাণশিবির দেখা যায়। খুব নিপুণ দক্ষতা ও বেগে কাজ হচ্ছে। এখন সবজি-চাল-ডালে পাতলা খিচুড়ি বিতরণ চলছে। পাশেই স্বাস্থ্যশিবির। সেখানে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী দেখছে মানুষদের।

কৌশলজী ধুতি ও কুর্তা পরিহিত ভারি চেহারার মানুষ। তিনি বলেন, পত্রকারজী! ছবি তুলবেন তো!

—তুলব।

—আমরাও তুলছি। লিখে দিবেন যে পিরথাতে আমরা এর আগেও এসেছি আর সরকারি লোকদের ঔদাসীন্যে এদের

এই হাল। ব্লক অফিসে বহোত স্কীম আছে। এদের দারিদ্র্য ফট্‌সে দূর করা যায়।

হরিশরণ বলে, আপনি উদ্যোগ নিন। আমার চেয়ে আপনার কথা সরকার বেশি শুনবে।

— হ্যাঁ, এখানে ইউনিট দরকার।

—ব্লক আছে, স্কীম আছে, শংকর।

—হাঁ সরকার।

—এদিকে এস। নোট নাও পূরণ। এঁরা বলছেন, ব্লকে অনেক স্কীম আছে, আমরা তোমাদের সাহায্য দেখাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে আমার আগেও কথা হয়েছে, কিন্তু এঁরা তো শোনেননি। সরকার বেঁধে ধরে স্কীম দেয়। তোমাদের আম ঘর পিছু গরু দিতে চেয়েছিলাম, নিয়েছিলে?

—কৈসে সরকার? গরুকে কী খাওয়াতাম?

—ছাগল তো দিয়েছিলাম।

শংকর ওপরপানে চায়। উদাস গলায় বলে, সেবার কী হাল পিরথার! কিছু নেই বাবলা পাতা ছাড়া। ছাগল আদিবাসী, সরকার! খুব কম খেয়ে বাঁচতে জানে। কিন্তু তাও তো ছিল না। ভালপুরা থেকে লোক এল। পাঁচ-সাত কিলো কোদো দিল, আমরা ছাগল দিয়ে দিলাম। ছাগল কী খেত?

—মুরগিও দিয়েছিলাম।

—সাব, মানুষ যদি খেতে না পায়, ছাগল মুরগিকে কী খাওয়াবে তাই বলো।

হরিশরণ বলে, দিই নি হাঁস। সেটা নিদারুণ ঠাট্টাই হত। জল কোথায় এখানে? কৃষিতে সহায়তা ··

শংকর বলে, নিচে আমাদের জমি থাকলে আমরা তবু চাষ করতে পারতাম।

—কৌশলজী ! এদের মালিকানায় যে জমি ছিল তা তো কবে চলে গেছে ।

—ট্রাইবাল জমি ! উদ্ধার করে দিন ।

—কেমন করে ? সে কি আজ গেছে ? ওরা চাষ করে এই পাহাড়ের ঢালে পাথরঝারা জমিতে। এ জমিতে কি কৃষিসহায়তা দেয়া যাবে ? এ জমিতে কিছু কোদো. কিছু কুটকি···তাও তো হবে যৎসামান্য ।

—আমি জমি বের করে নেব সরকার থেকে, ওরা পাহাড় থেকে নিচে নামুক, সেখানে চাষ করবে, গাছ লাগাবে, জলও পাবে, কলোনি করে দেব ওদের ।

—ও, সেই জমি ?

—দেখা যাক ! মেয়েদের সমবায় করে তাঁত শিখাব, আর স্কুল তো থাকবেই ।

—দেখুন !

শংকর এখন বলে, সে কোথায় ?

—ডালপুরার পশ্চিমে ।

—পাহাড় তো নেই ।

কৌশলজী এখন ইংরিজিতে দ্রুত বলে যান, পাহাড়ে থাকবে, তাহলে তো এ সব রাস্তাটাস্তা উপড়ে ফেলে নিচে চাষের জমি দিতে হয়। ওসব অবাস্তব কথা ভুলে যেতে বলুন। ওদের বলুন সহযোগিতা করতে। সহযোগিতা করলে আদিবাসীদের উন্নতি হয় না ? দেখে আসবেন আমাদের জীজাগড়ের আশ্রমে ।

—শিব মন্দির আছে ওখানে পুরণ, দেখার জিনিস ।

—আমাদের জীজাগড় আদিবাসী কল্যাণ আশ্রমে দুশো আদিবাসী পরিবার···

পুরণ বলে, দেখেছি দূরদর্শনে ।

—আপনারা তো পারছেন না হরিশরণজী। ঘরও করে দেননি,

অথচ R. L. E. G. P বলছে গৃহহীন আদিবাসীকে ঘর করে দাও। এগুলো ঠিক নয়।

— ঘর বানাবার জন্যে সরকার যে টাকা দেয়, তাতে তো পাহাড়ের ঢালে পাথরের ঘর করা যায় না। এবার কুয়া কাটাব আরো কিছু।

কৌশলজী ইংরিজিতে বলেন, ধীরে, বন্ধু ধীরে। অত সহায়তা করলে ওরা এখানে গেড়ে বসে থাকবে। কিন্তু জায়গাটা বরবাদী, কনডেমড। ওদের সরাতে পারলে এই নদী-পাহাড়-কিছু গাছ আছে, আরো গাছ লাগালে চমৎকার একটি পিকনিকের জায়গা হবে। মাধোপুরা রাজ্য ট্যুরিজমে আমার শালাই আছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আর আপনি তো জানেন, ভূপালে আমার···

জীর্ণ বাড়ি কনডেমড হয়। এবং আদিবাসীদের বসতভূমিও। জনজাতির বাসের পক্ষে অযোগ্য এবং পিকনিকের পক্ষে যোগ্য। কিন্তু শংকর কাল বলছিল, চারদিকে বন ছিল, এখন কিছু নেই। তবু পিরথাতে এখনো আমাদের বাপ-দাদা-পরদাদাদের সমাধি আছে। পিরথার জলে আমরা অশৌচের পর মৃতদের অস্থি ভাসাই। এখন তো সমাধি দিতে পারি না, জ্বালাই। তারপর নতুন ভাঁড়ে ছাই নিয়ে সমাধি দিই, তাতে পাথর দিই।

এখান থেকে, অতীতকে পিছনে রেখে শিকড় উপড়ে নিয়ে ওরা কি যাবে নতুন কলোনিতে? কলোনিতে আদিবাসী। ভবিষ্যৎ ভারতে ওরা থাকবে একটা জায়গায় সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে, না মিশে যাবে মেনস্ট্রীমে? না আদিবাসী জাতি চরিত্র বদলিয়ে অন্যরকম হয়ে যাবে? সংরক্ষিত, জালে ঘেরা প্রাণীরাও তো নিরাপদ নয়। কোথায় যেন পশুশালায় পশুরক্ষীরাই বন্দী হরিণ কেটে খেয়ে নিয়েছে।

হরিশরণ কৌশলজীকে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই।—বস্তুত ওঁর সব কথাতেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর ঘাম মুছে পূরণকে বলে, এখন এঁরা কী করছেন তা তো দেখলে। এঁদের যত প্রকাশিত লিটারেচার, তোমাকে দিয়ে দেব। কৌশলজী! আমি ওকে একটু

এগিয়ে দিই।

—কি, উনি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছেন না ?

—না। ও শুধু ঘুরছে, দেখছে, নোট নিচ্ছে।

—সেই তো চাই। কাল থেকে ভি, ডি, ও ফিল্ম ওঠানো হবে। আমরা সবসময়ে ভি, ডি, ও ছবি তুলে রাখি।

—আপনি লা-জবাব !

—এস. ডি. ও. আসবেন, আপনি থাকুন।

—এখনি আসছি।

এগিয়ে এসে হরিশরণ বলে, ওঃ ! কী লোক !

—উনি কলোনি করবেন ?

—আরে ! জমিটা তো ওঁরই। আরেকটা সমিতি করবেন। সেটা রেজেস্ট্রি হবে, তাকে ওই জমিটা দান করবেন আদিবাসী কল্যাণে। তারপর টাকা বাগাবেন কোথাও থেকে। নানারকম ফাণ্ড পান ! বিদেশী টাকাও। কী বলব বলো ! এ সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ঢুকতে পারছে, কিছু কাজও করছে, সে তো সরকার কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই। ও সব হতে অনেক দেরি, আর আমি মনে করি না এরা যাবে।

—হ্যাঁ, এটা ওদের সেই জায়গা, যেখানে বিস্মৃত অতীত থেকেই আছে।

—না গেলে এখানে বা কী করে বাঁচে ! যাক গে। এখন যদি ওরা দশদিন শিবির চালায়, তা হলে বাঁচি। জল হয়েছে, কোদো বীজ দিয়ে দেব, সার। আর কয়েকজনকে এগ্রো-ফার্মে ট্রেনিং দিলে ওরা সেচ লাগে না তেমন ফসলও, চীনাবাদাম চাষ করতে পারে। দেখা যাক ! আমার তো বহুমুখী লড়াই। শংকরদের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে, রাজনীতিকদের সঙ্গে, কৌশলজীর উপরমহলে খুব প্রভাব।

হরিশরণ "বাই বাই" জানায়।

—কাল কিছু আনব তোমার জন্যে ?

—সামান্য মাছ।

রেঁধে আনব ?

—না না, আমি সব পারি। কাঁচা মাছ, ছোট মাছ।

—মাছ !

না পারলে এনো না।

—খুব কঠিন হে ! যদি না পারি, ফেরার সময়ে মাছ খাইয়ে দেব। জল হয়েছে, পিরথার কুণ্ডীতেও ছোট ছোট মাছ মিলতে পারে। কিন্তু জনপদ মরে যাচ্ছে, কে মাছ ধরে ?

—ফেরার সময়েই খাব।

—সেই ভালো।

হরিশরণ চলে যায়। ছাত্রজীবনে ওর আশা ছিল কৃষি অর্থ-নীতিবিদ হবে, পূরণ জানত, ও অধ্যাপক হবে। জীবনের চাকা খুব ঘুরে যায়। এখন স্বচ্ছল ও শিক্ষিত বাপ-মা, সন্তানদের কোনদিকে মন তা বুঝে, সেই কেরিয়ারের উপযোগী করেই শিক্ষা দেয়।

শংকর, বিখিয়া, সন্তান বেঁচে থেকে বিমূঢ় দিমাগ (প্রথম দিন খই চূরণ, গুড় গোলা শরবতের বাটি হাতে ধরে বাটি নামিয়ে হো হো করে কেঁদেছিল, সেই তো সাহাবা আনলে সরকার। আগে আনলে মাগানিকে আমি বেচতাম না !) এদের বাপ-মা কোনো কেরিয়ার প্ল্যানিং করেনি, যেমন ফ্যামিলি-প্ল্যানিংও করেনি। ওরা জানত যে পাথুরে মাটিতে কোদাল মেরে কোদো চাষ, পারলে ছাগলচরাই, এর চেয়ে উজ্জ্বল কোনো কেরিয়ার ওদের হবে না।

কাল সরপঞ্চ ওদের সকলকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল নতুন পোস্টার বিলিয়েছে, "বিচ্ছিন্নতাবাদ বন্ধ করুন" সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং হিংসার পথ পরিহার করুন।" দিমাগের বউ বলছিল, এ কাগজ ভালো নয়, খুব পাতলা।—সে এখন গর্ভবতী, একটি তিন বছরের মেয়ের হাত ও ধরেই থাকে, যেন কেউ শিশুটিকে কেড়ে নেবে। সে কথাও বলে।

—হাঁ শংকর ! আমরা সবাই মিলে মরব কবে ?

—শংকর ! এবার রিলিফ এল কেন ?

—শংকর ! বৃষ্টি হল কেন ?

বৃষ্টি ওদের পাওনা নয়, রিলিফ ওদের পাওনা নয়, পূর্বপুরুষদের আত্মা ছায়া ফেলে ঘুরে গেছে, তাই নিঃশেষে মৃত্যুই ছিল ভবিতব্য।

পুরণ নেমে যায় পিরথা কুণ্ডীর দিকে। পরনে লুঙি, গায়ে গামছা, খালি গা। এখন চটিটা খুলে ও পাথর কাটা ধাপ ধরে নামে। তেমন পাথর হলে দীপ, মোমদানী, ছাইদানী, ঘটি, ফুলদানী, এসব বানানো যায়। অবশ্য তা হাজার হাজার তৈরি হলে তবে হোলসেল কিনতে আসবে ব্যাপারী। বাণিজ্যিক পণ্য হতে হবে। আর পাতলা পাথরের ফলকে, ওদের ঘরে যেমন আছে তেমন মাছ, হাতি, মানুষ, তীর-ধনুক, পাখি খোদাই করলে রাজ্য শিল্প এম্পোরিয়াম, আদিবাসী শিল্প রপ্তানিকারক ধনী বুটিক, তারা আগ্রহী হবে। পিরথার মানুষরা কী পাবে ? প্রতিটি প্রশ্ন পৌঁছচ্ছে এক বিরাট নিরুত্তরে।

কুণ্ডীর জল যথেষ্ট ঠাণ্ডা এবং পায়ের নিচে পাথর। মাছ পায় না পুরণ, পাথরে আটকে থাকা শ্যাওলা তুলে গামছায় বাঁধে। ভীষণ, ভীষণ সমস্যা পুরণের সামনে।

ফেরার পর দেখে বিখিয়া বসে আছে।

শ্যাওলাগুলি পুরণ ওকে দেয়।

ওদের পূর্বপুরুষের আত্মা আধবোজা চোখে চায়। চাল, কোদো, কিছু মরা ফড়িং। ছোট ছোট মাছ ও কাদা, (বিখিয়া তবে মাছ ধরেছিল) সবই পড়ে আছে। জলপাত্রটি আবার ভরে রেখেছে বিখিয়া।

পুরণকে ওই চোখ কিছু বলতে চায়।

পুরণ জানে না ওই চোখের ভাষা।

পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসে পুরণ এক নব আগন্তুক। কয়েক, কোটি বছর বয়স মানুষের।

ও পুরণের অনেক আগে এসেছিল।

পুরণ ও বিখিয়া বেরিয়ে আসে। গর্ভগৃহটি জান্তব আমিষগন্ধে ভরে গেছে। এই আমিষ গন্ধ এক অচেনা গন্ধ।

এখন বিখিয়া ওর দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত মেলে দেয় মূকাভিনয়ে। ঘুরে ঘুরে হাত নেড়ে নেড়ে ভেসে ভেসে ওড়ার ভঙ্গিমা। ঘুরতে ঘুরতে একটি হাত দেওয়ালে আছড়ায়। সে হাতটি এখন অল্প নড়ে। চোখ তীক্ষ্ম করে তবু ঘোরে বিখিয়া। তারপর বসে পড়ে হাত বিছিয়ে, আর হাত টেনে টেনে চলে যেতে থাকে গর্ভগৃহের দিকে, নিশ্চল হয়।

—হ্যাঁ বিখিয়া, বুঝেছি। একটা ডানা ভেঙে গেছে তাই টেনে টেনে চলছিল। পারলে কোনো পাখি আনিস। যদি পারিস!

বিখিয়া চলে গেলে পুরণ নিঃশ্বাস ফেলে হরিশরণের দেওয়া প্যাকেটটা খুলেছিল। আর গর্ভগৃহের উদ্দেশে মনে মনে বলেছিল, ক্ষমা কোর, ক্ষমা কোর।

চার

"সরীসৃপ সমুদ্রে, আকাশে।

টেরোড্যাকটিল :—মেসোজোয়িক যুগের টেরোসোরিয়া শ্রেণীর উড়ন্ত সরীসৃপ, বিলুপ্ত প্রাণী। এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল ওড়ার পক্ষে উপযোগী, হাড় ফাঁপা ও বাতাসে বোঝাই (প্রাণীদেহে হাড়ের ভিতর মজ্জা কবে থেকে হল?), সামনের প্রত্যঙ্গের (এরা চতুষ্পদ) চতুর্থ আঙুলটি অস্বাভাবিক লম্বা, তা ধরে থাকে গোটা শরীর ও উরু-ঢাকা এক ফ্লাইং মেমব্রেইন, বা উড়বার ঝিল্লীকে। টেরোড্যাকটিলরা সম্ভবত মাছ খেত। এদেরই প্রাচীনতর সংস্করণ, যেমন র‍্যামফোরাইনকাসদের তখনো ছিল সরীসৃপের লম্বা লেজ এবং অসংখ্য দাঁত।

(এই প্রাণীটি দন্তুর নয়। এর লম্বা লেজ নেই, আবছা আলোতে পুরণ দেখেছে এবং সে সুনিশ্চিত)। পৃথিবীর জুরাসিক যুগের

প্রাণী টেরোড্যাকটিলাস আকারে ছিল চড়াই পাখির মতো, লেজ তার খুবই ছোট এবং মুখের সামনের দিকেই ছিল দাঁত। (এ আকারে তার চেয়ে বড়)। ক্রিটেসিয়াস যুগের টেরানোডন ছিল অনেক বড়, ডানার সাপট পঁচিশ ফিট মতো, মাথার খুলির পিছন দিক থেকে দীর্ঘ ঝুঁটি (চামড়ার ?) এবং লম্বা নিদন্ত ঠোঁট।

(টেরোড্যাকটিলাস, টেরানোডন, টেরোড্যাকটিল !) এখন অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরাই সন্দেহ করেন যে টেরোড্যাকটিল ডানা ঝাপটে উড়তে পারত না।

ওড়বার পক্ষে আবশ্যিক যে বড় বড় মাংসপেশী, তা ধারণ করবার মতো যথেষ্ট সবল ছিল না ওদের স্টেরনাম বা উরঃফলক। আধুনিক প্রাণিজগতের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে আমরা যা জানি, তাতে মনে হয়, ওরা ভারি শরীর ও ও-রকম ডানা নিয়ে ঢেউয়ের মতো ভেসে ভেসে উড়ত, নিচে নামত, উপরে উঠত, এই রকম আর কি !”

“....এদেরই একটি গ্রুপ, টেরোসরস-দের ছিল বাদুড়ের মতো চামড়ার পাখা। (টেরোসরস গ্রুপেই টেরোড্যাকটিলাস, টেরানোডন, টেরোড্যাকটিল)। এরা সরীসৃপ থেকে ডানা মেলা সরীসৃপ হয়ে আকাশচারী হয়। সম্ভবত এরা, অল্প জলের মাছ ধরে খেত ছোঁ মেরে। নিজেরা গা ভেজাত না। এরা নয়, অন্যান্য প্রজাতির উড়ন্ত সরীসৃপরাই বিবর্তিত হয়ে পাখিতে রূপান্তরিত হয়। প্রথম যে পাখির অস্তিত্ব জানা গেছে, তা হল আরকেওপ্টেরিক্স্ ! কাকের মতো মাপের এই পাখি বিদ্যমান ছিল প্রায় চোদ্দ কোটি সত্তর লক্ষ বছর আগে।”

বই বন্ধ করে পূরণ। উঠে যায়। আজ শুক্লপক্ষের আকাশ পাতলা মেঘে ঢাকা এবং অন্ধকার কী তরল, যেন গলে গলে পড়ছে। গর্ভগৃহের মুখ চাপা এখন ঘাসের আগড়। বিঁথিয়া এখন পুজোও করছে, রিলিফের খাবার ওখানে বসেই খাচ্ছে, তার চোখ ধূসর ও শান্ত পূরণের সঙ্গে এই ব্যাপারটি গোপন রাখার শর্তের পর,—ও বোবা

থেকেই শর্তটি সমাপিত করে, বস্তুত, পূরণ ভাবে, কথা আমরা অপ্রয়োজনেও বলি অভ্যাসবশত, অনেক কম কথায় কাজ চলে যায়,— এ সব করার পরেও সে বাবলার সরু ডাল চেঁছে ঝাঁপ করে ঘাস দিয়ে আগড় বেঁধে ফেলার সময় পাচ্ছে।

না, চড়াইয়ের মতো ছোট নও, আবার পঁচিশ ফুট ডানার সাপটও নও, দুটির মধ্যবর্তী কোনো একটি, —কাছে যাব না, ছোঁব না তোমাকে, ক্যামেরায় ছবি তুলব না ফ্ল্যাশ জ্বলবে। আমার মনে হচ্ছে ভেসে ভেসে উড়তে উড়তে কোথাও বসেছিলে তুমি, বিখিয়া তোমাকে তখনি দেখে এবং ছুটে এসে খড়িতে এঁকে ফেলে।

তোমার চোখ কি বিখিয়াকে কোনো বাক্‌শব্দহীন বার্তা দিয়েছিল তীব্র জরুরি? যে জন্য তোমার চেহারা ওর মস্তিষ্কে জেরক্স হয়ে বসে যায় এবং ও দৌড়ে এসে এঁকে ফেলে খড়িমাটিতে সে ছবি? তারপর কি ওর মনে হয়, খড়িমাটির ছবি মুছে যায় বড় সহজে, তাই ও তুলে নিয়েছিল ছেনি বাটালি? বিখিয়া কথা বলছে না কেন? কেন বোবা হয়ে আছে? ওর চোখ, তোমার প্রাগৈতিহাসিক চোখে কোন সংবাহন স্থাপিত হয়েছিল, যে ও (নিরক্ষর. কোনো বই পড়ে নি, কিছু জানে না ও পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস) বুঝে নেয় তোমার ব্যাপারটা গোপন রাখা তীব্র জরুরি। তোমার কথা জানানো চলে না আজ-কি-দুনিয়াকো। "আজ" জানে না "অতীত"-কে, "আদিম"-কে। "আজ", "বর্তমান সময়", "সভ্যতা", এগিয়ে চলার তাগিদে অত্যন্ত বর্বর হয়ে যায় অথচ সে তা জানে না। রাস্তা ব্রিজ করে, অরণ্য কেটে "আজ" কলুষিত করে আদিম জাতিগুলির সমাধিক্ষেত্র। তোমার অস্তিত্ব জানলে তারা তোমাকেও ছেড়ে দেবে না, এ জন্যই ও তোমার ব্যাপারটা রক্ষা করছে পবিত্র চিতাভস্ম বা মৃতের অস্থির মতো। কোনো একটা মিল ও পেয়েছে। ও আদিবাসী, তুমি ওর অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক আদিম, তোমাদের অস্তিত্ব ভীষণ বিপন্ন।

কিন্তু হে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর প্রথম ও শেষ জীবন্ত দূত!

এটাও নিদারুণ ও নির্মম সত্য, সময় এগোবে, সময়ের চাকা অনেক কিছু ধ্বংস করে এগোবে। আঠারো তারিখকে শত চেষ্টাতেও সতেরো তারিখ করা যাবে না। একমাত্র কল্প-বিজ্ঞান-গল্প রচিয়তারাই তা পারেন। "কিউট" এবং "ও বেবি!" এবং "ও বয়!" মার্কা ছেলেমেয়েরা এবং মনে মনে যাঁরা নিয়ত পলাতক, যাঁরা একটি "টাইডি" এবং মসৃণ সমাজ-ব্যবস্থায় আরামে থাকেন, তাঁরা সে-সব গল্প পড়ে বিমল আনন্দ পান। কিন্তু ভারতবর্ষে, পৃথিবীতে, কোথায় কি আছে "টাইডি", চমৎকার, মসৃণ? তা আছে কতিপয়ের জন্যে। অধিকাংশের জন্য সময় মানে দস্তুর, নখর, রক্তাক্ত সংগ্রাম এবং সংগ্রাম মানে সবসময়ে একরকম নয়। সময়, জটিল সময়, কম্প্যুটারের সাধ্য কী, যে এ সময়কে প্রসেস করে ডাটা-শিট প্রসব করে?

গর্ভগৃহের ছাদ উড়ে গেছে। শুক্লপক্ষের আকাশ লঘু মেঘে ঢাকা, মেঘ সঞ্চরমান, কোথাও তো জল আছে, কেননা চন্দ্রকিরণে চন্দ্রসভা হয়েছে। অন্ধকার কী স্বচ্ছ, কী তরল, গলে গলে পড়ছে, এমন অন্ধকারে সব দেখা যায়। না, আমি তোমাকে স্পর্শও করতে চাই না। ডানা মুড়ে তুমি নিস্পন্দ, তোমাকে ছুঁতে চাই না আমি, তুমি আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুভূতির-বাইরে, কে হাত রাখতে পারে মেসোজোয়িক মহাযুগের তৃতীয় পর্বের অন্তিম ও কেনোজোয়িক মহাযুগের সূচনার সন্ধিক্ষণে? সে তো সাড়ে সাত কোটি বছরের কথা। মানুষের পূর্ব পুরুষের সূচনা বড় জোর এক প্রচণ্ড আলোড়নে। শেষ হয় মেসোজোয়িক মহাযুগ, শুরু হয় কেনোজোয়িক মহাযুগ, যা এখনো চলছে। সে সময়েই মহাদেশগুলি আবারও সরে যায়, আজকের চেহারা নেয়। তোমার সে সময়ে বিলুপ্ত হবার কথা। মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, ঋতু ও আবহাওয়া বদলাচ্ছে। তোমার পৃথিবীতে কি ছিল এমন গোধূলি? কোন সমুদ্র, কোন উদ্ভিদ, কোন মাছ দেখেছ তুমি? এবং তুমি কি ছিলে না, কোনো জরুরি সংবাদ আজকের মানুষকে জানাবে বলে বইয়ের ছবি থেকে উঠে এসেছ অবয়বী হয়ে, চলে এসেছ এখানে, কেননা

পিরথাও অন্য কারণে বিপন্ন, তার অস্তিত্ব আক্রান্ত ?

না, তোমাকে স্পর্শ করতে অনধিকারী আমি। প্রাগৈতিহাসিক মাছদের এখনো নাকি দেখা যায় সমুদ্রে। কিন্তু কোথাও টেরোড্যাকটিল ছিল, ছিল, পৃথিবী জানত না. আমি স্তব্ধ, আমি পরাজিত। কাছে গিয়ে দেখব না পালক আছে কি না, সামনের পায়ের আঙুল বা নখ কি সত্যিই লম্বা।

পূরণের চোখ প্রশ্ন করে।

—কী খাবে তুমি ?

ওর চোখ পূরণকে কী জানাতে চায় ?

ধূসর গোধূলি দিয়ে অথবা এই তরল অন্ধকার দিয়ে গড়া অবয়ব, একেবারে নিস্পন্দ। শুধু অপরিচিত একটা গন্ধ. কখনো তীব্র, কখনো মৃদু। পূরণ দাঁড়ালে, বিথিয়া দাঁড়ালে গন্ধটি মৃদু ও ক্ষীণ হয়ে আসে। অপরিচিত প্রাণীদের কাছে থেকে আত্মরক্ষা করার সহজাত কোনো অনুভূতি ?

চোখে চোখে কোনো সংবাহন হয় না।

শুধু ধূসর প্রতীক্ষা, অন্তহীন।

কী জানাতে চায় ? আমরা বিলুপ্ত প্রাকৃতিক, অবশ্যম্ভাবী ভূ-বিবর্তনে। তোমরাও বিপন্ন। তোমরাও বিলুপ্ত হবে পারমাণবিক বিস্ফোরণে, অথবা যুদ্ধে, দুর্বলকে নিশ্চিহ্ন করে সবলের আগ্রাসী অগ্রসরণে, যা শেষ অবধি তোমাদের নগ্ন, বর্বর, আদিম করে দিচ্ছে, অগ্রসর হচ্ছ, না পিছিয়ে যাচ্ছ, ভাবো। অরণ্য বিলুপ্ত, জীবজগৎ পশুশালা ও সংরক্ষিত অভয়ারণ্যের বাইরে নিশ্চিহ্ন। শেষ অবধি কী ফলাবে মাটিতে, প্রকৃতিকে হনন করে মানব আরোপিত প্রযুক্তি নিয়োগে ? "মারাত্মক ডিডিটি শাক, ভাগাড়ের সবজি,/ উপড়ে তোলা স্তম্ভিত পেঁয়াজ, তেজস্ক্রিয় আলু,/ বিনের মধ্যে বিস্ফোরক দানা, বিশাল বেঢপ/ প্ল্যাস্টিক লাউ, চলন্ত ল্যাজওলা বেগুন,/ হিংস্র অক্টোপাস লতা, পশুর রক্তভরা টমেটো।" ২১

আদিম জাতিগুলির জাতিসত্তা নিষ্পেষিত, প্রকৃতির মতো ধরিত্রীর মতো ধারয়িত্রী তাদের প্রাচীন সভ্যতা কোনো মর্যাদা পেল না, পরিচিতি ঘটল না, শুধু ধ্বংস হল, ধ্বংস হচ্ছে, এই কথা জানাচ্ছ ?

ধূসর নিমীল চোখ নিরুত্তর।

তুমি কি সাবধান করে দেবার জন্য অতীত থেকে উঠে এসেছ, বলছ এ মানবসৃষ্ট দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ পাপ, এই ব্যাপক তৃষ্ণা পাপ, পাপ অরণ্য কেড়ে নিয়ে অরণ্যজীবী মানুষদের নগ্ন ও বিপন্ন করে দেওয়া ? তুমি কি বলছ প্রতিবাদের কণ্ঠ, লড়াইয়ের হাত, সব টিপে ধরা, ভেঙে ফেলা পাপ ?

চোখ কোনো কথা বলে না।

কী ধূসর, কী আশ্চর্য চোখ! কিছু জানাতে চায়, কিছু বলতে চায়, পূরণ বোঝে না। নো কম্যুনিকেশন পয়েন্ট। কোনো কথা বলা যাবে না, লেখা যাবে না।

ওর শরীরের গন্ধে কি কোনো বার্তা আছে ? ওর চোখ চেয়ে আছে কেন ? এক গরিব আদিবাসীর (যে মৃত), পারিবারিক দেবতার গর্ভগৃহে (পূজ্য ও পূজারীরা চলে গেছে) নিশ্চল বসে হে প্রাচীন, তুমি কী জানাতে চাও ?

ধূসর চোখ নিরুত্তর।

তুমি আমার শরণার্থী, এবং আমি জানি না কেমন করে তোমাকে বাঁচানো যায়, সে জন্যই আমি তোমার মৃত্যু দেখব ? জানি না, জানলে বাঁচাতে পারতাম, আবার তুমি উড়াল দিয়ে চলে যেতে, খুঁজে নিতে জল, খাদ্য, আশ্রয়। জানি না, জানলে····এই পাথর ও মাটির গর্ভগৃহে এই শতাব্দীর অন্তিম পর্বে মানুষের জানা দরকার এমন কোনো জরুরি সংবাদ এসেছিল এবং মানুষ সে ভাষা জানে না, বোঝে না বলে সংবাদটি দেওয়া গেল না।

ধূসর চোখ চাইছে পূরণকে কিছু জানাতে।

পূরণ মাথা নাড়ে, মাথা নাড়ে।

জলপাত্র যেমন, তেমনি আছে। বিখিয়ার নিবেদন কত শ্যাওলা, এক মুঠো মাছ, কীটপতঙ্গ, খাজড়ার কন্দ, কোদো, চাল, সব পড়ে আছে।

পূরণ পিছিয়ে আসে, ঘাসের আগড় বন্ধ করে।

সযত্নে তুলে ফেলে হরিশরণের দেওয়া বই। বইয়ের তথ্য পড়ে সে বেশি জানতে পারে, এবং আলোচ্য বিষয়টি সামনে সশরীরে উপস্থিত। তবু সে জীবন থেকে জানতে পারে না কিছুই।

রাঁচিতে মুণ্ডা গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময়েও কত কম বুঝেছিল এবং এস সি. রায়ের বই পড়ে তবে জেনেছিল ওদের কথা। সরস্বতী বলে, আমার মনে হয়, আমার বিষয়ে কোনো বই নেই বলে এত বছর আমাকে কাছে পেয়েও আজও আমাকে জানতে পারনি।—পারিনি সরস্বতী। হোমিনিডি—হোমিনিডি—হোমো স্যাপিয়েন্স-ম্যাপিয়েনস, —মানুষ, আধুনিক মানুষ এখন জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে জীবনকে জানতে ভয় পায়। বই পড়ে, তত্ত্ব পড়ে তবে জীবনকে জানা অনেক নিরাপদ।

কিন্তু পিরথা বুকে নিরন্তর অনশনের দুর্দিনে টেরোড্যাকটিল যদি ছায়া ফেলে ওড়ে, পিরথার আদিবাসীরা যদি মনে করে তাদের বিলুপ্ত জনপদে পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্র অবমানিত তাই শোকার্ত হয়ে ফিরে এসেছে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা, এবং বিখিয়া, এক নিরক্ষর আদিবাসী তরুণ যদি পাথরের দেয়ালে এঁকে রাখে টেরোড্যাকটিল এবং তা দেখে, তার ছবি তুলে যদি পত্রকার সুরজপ্রতাপের মস্তিষ্কে ঘটে বিস্ফোরণ, এবং তার তোলা ছবি যদি লুকিয়ে ফেলে এস. ডি. ও "না, কোনো অসম্ভবকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। কেননা টেরোড্যাকটিলকে যদি মেনে নিতে হয়, হোমো স্যাপিয়েন্স-ম্যাপিয়েন্স কোথায় থাকে? দুজনের পৃথিবী তো আলাদা"—এই যুক্তিতে, এবং পিরথা জনপদ যখন অশৌচে অশুচি, সে সময়ে যদি হরিশরণের এস ও. এস. পেয়ে

মঞ্চে ঢোকে পত্রকার পূরণ, (উচ্চারিত আবেদন, পিরথাকে দেশের ম্যাপে তোলা এবং অনুচ্চারিত আবেদন হোয়াট অ্যাবাউট দি মোস্ট মিস্টিরিয়াস মিস্ট্রি অফ দি সেনচুরি ?) এবং সঘন গগন বরষা রাতে যখন বৃষ্টি পড়ছে, তখন যদি পূরণের ঘরে আগড়হীন দরজা দিয়ে ঢোকে টেরোড্যাকটিল, এবং চলে যায় দেবতাহীন গর্ভগৃহে (অমন সিধা চলে গেল, আগেও কি ও ওখানেই থাকছিল ?) এবং তা দেখে পূরণের মাথায় ঘটে বিস্ফোরণ (এ সত্য গোপনে রাখতে হবে, এ আবিষ্কার , এবং ব্রাহ্মমুহূর্তে বিখিগ্য আসে ও নির্বাক থেকে নত মস্তক হল, এবং সকাল না হতে পূরণ যখন তার আশ্চর্য, ব্যাখ্যাতীত আবিষ্কারের ধাক্কায় একেবারে দিশাহারা, তখন যদি সে জানে কাল যারা ওকে বহিরাগত শত্রু মনে করেছে, আজ তারাই ওকে 'এ এল, এর পায়ে পায়ে বৃষ্টি এল, মাটি ও আমাদের, নদী ও কুয়ার তৃষ্ণার জল' বলে অন্য চোখে দেখছে,—তখন পূরণের যে কী কর্তব্য, সে বিষয়ে কোনো বই লেখা হয়নি।

কোনো তৃতীয় ব্যক্তি লিখলে সে বই পড়ে পূরণ সমগ্র ব্যাপারটির একটা প্রেক্ষিত পেত।

লেখার কোনো লোক নেই।

এবং পূরণ এই তিন দিনে রক্ত কোষে, মস্তিষ্ক কোষে জেনেছে যে এত তদন্তমূলক সমীক্ষা লেখার পরেও সে কিছুই জানে না, জানেনি। মানুষের কাছে প্রথম পাঠ না নিয়েই সে শতাব্দীর অন্তিম পর্বে পৌঁছে গেল। অথচ সে তো মানুষকে দেখেছে দুঃসহ দুর্দিনে, অত্যাচারে স্বৈরাচারে প্রতিবাদ করতে এবং প্রতিবাদের প্রতিবাদে অত্যাচারীর রক্তোৎসব, সে তো দেখেছে শাল বনাম সেগুনের যুদ্ধ, অ্যাসবেসটস খাদানে বিষাক্ত অ্যাসবেসটস ধূলিতে আক্রান্ত মানুষের প্রতিবাদ শিল্পপতির বিরুদ্ধে, দেখেছে বন্দীদের অন্ধ করে পুলিশের আত্মসমর্থন।

এমন দেখেছে কত, দেখেছে এবং লিখেছে এবং ফিরে এসেছে

নিজের নিরাপদ ঘরে যেখানে তার বই গুছিয়ে, ধুলো ঝেড়ে, সরস্বতী বসে থাকে প্রতীক্ষা করে, কবে পূরণ বলবে, 'এসো, আমার ঘরে এসো আমার ঘরে'—কিন্তু তাও তো পূরণ বলেনি।

কিছুই জানেনি সে, জানতে চায়নি বলে। এবং এমন এক আধা-মানুষ, শিকড়হীন পরগাছার কাছেই আসে দুঃসহ কোনো সাবধানী সংবাদ জানাতে প্রাচীনা পৃথিবীর দূত।

পূরণ কী করবে?

আজ, ব্রাহ্ম মুহূর্তে বিখিয়া আসে আদিম শিকারীর মতো উল্লাসদীপ্ত মুখে লাঠিতে একটি সদ্য নিহত বামন সাপ নিয়ে। পূরণের দিকে চেয়ে সোজা চলে যায় ঘাসের আগড় ঠেলে।

পূরণ দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ বাদে বিখিয়া বেরিয়ে আসে। প্রভাতী আলোয় ধুয়ে যাওয়া পাহাড়ের পাথরে আকাশের পটভূমিতে তার মূকাভিনয়।

এখন ওর দু-হাত ডানা, দুমড়ে ভেঙে পড়ে শরীর, মাথা ঘোরায় ও, দু হাত নেমে আসে, নিশ্চল। পূরণের দিকে চেয়ে থাকে সপ্রশ্ন চোখে।

পূরণ মাথা নাড়ে।

—জানি না বিখিয়া, ও কী খাবে, কেমন করে বাঁচবে, ও কী চায়।

বিখিয়া নিশ্বাস ফেলে মাথা নামায়, দুমড়ে ভেঙে পড়ে থরথর কাঁপে শরীর।

—কাঁদিস না বিখিয়া। ওকে সেবা করে যা। আর শোন্, পাহাড়ে কোথায় কোন গুহা আছে, আমি তো জানি না, আমাকে আজ নিয়ে যাবি তুই। খুব লুকানো কোনো গুহা, যেখানে কেউ কোনদিন যাবে না।

ওর মাথায় গায়ে হাত বুলায় পূরণ। কোনো সংবাহন হয় কি? কত কিছু অজানিত রেখেই পূরণকে চলে যেতে হবে পিরথা ছেড়ে।

খুব নরম, কোমল গলায় বলে, সময় কোথায় বিখিয়া? কোনো

জায়গা তো পেতেই হবে। তুই আর আমি ছাড়া কেউ তো জানে না।

বিখিয়া উঠে দাঁড়ায়, মাথা হেলায়। তারপর চলে যেতে থাকে, যেন হঠাৎ ওর বয়সও কোটি কোটি বছর হয়ে গেছে, আর ও পারছে না, ক্লান্ত, শ্রান্ত ও। পা টেনে টেনে তাই চলা।

পূরণ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে, চোখ বোজে।

আশ্চর্য, এখন তো ওরা ঢোমরা বাজায় না।

ওরা কী জেনেছে, কোন্ সংবাদ?

পূরণ মনে মনে দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট লেখে।

সকালে পূরণ দেখেছিল, খোদাই করা ফলকের সামনে অনেক বাবলা ফুল, অনেক বাবলা পাতা, ফুল ও পাতায় ফলকটি যেন দেখা যায় না। আরো ছিল চাল এক মুঠো, মাটির পাত্রে মাটি, ছেঁড়া বস্ত্র খণ্ড আর ওই অর্ঘ্য রাখার জায়গাটুকু গণ্ডী কাটা। বিখিয়া দাঁড়িয়েছিল হেলান দিয়ে দেয়ালে। এখনো যারা আসছে, তারা সামনের পাথরে হাত ঠেকিয়ে কপালে ছোঁয়াচ্ছে। রেখে যাচ্ছে পাথরের সামনে বাবলা ফুল, পাতা, এক মুঠো মাটি। পূর্বপুরুষের আত্মা এসেছিল বিপন্নতাবোধে তাড়িত হয়ে এবং এখন বিখিয়াকে যেতে হবে কোনো গুহা সন্ধানে, কেননা অতিথির বিদায়লগ্ন সমাসন্ন, এখানে কোথাও সে থাকতে পারে না আর, সবই তো বর্তমান সময় আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেছে,—এখন সে ফিরে যাবে সময়ের স্রোতের বিপরীতে। আবার হয়ে যাবে নিশ্ছেদ গাঢ় অবিমিশ্র তমিস্রা,—বিখিয়া তাই সব দিয়ে দিচ্ছে অর্ঘ্যে। পাতা ও ফুল নাও, অরণ্য নেই। চাল নাও, বলির পশু বা পাখি নেই, মাটি নাও এক মুঠো, আর মাটি দখলে নেই। নাও ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো, ঘরের তাঁতের কোনো মোটা কাপড় নেই, ওটুকু জায়গা গণ্ডি ঘিরে দিলাম, কেন না আমাদের অস্তিত্ব ঘিরেও একটা অদৃশ্য গণ্ডি ক্রমশ ছোট হচ্ছে, আমরা ত্রাসিত, পালাবার পথ নেই।

পালাবার পথ নেই, ছিন্নভিন্ন আমরা কবে থেকে, টুকরো টুকরো রেণু রেণু, ছড়িয়ে গেছি কোথায়। বিখিয়া কি সে কথাই জানাচ্ছে

অর্ঘ্যে?

জানা যায় না. বোঝা যায় না কিছু। পুরণ আস্তে বলে, যেতে হবে বিখিয়া, আমি এখনি ঘুরে আসছি।

বিখিয়া বেদনাহত চোখে চেয়ে থাকে। ওর চোখ খুব দুর্বোধ্য এখন। এক অমূল্য, অত্যাশ্চর্য রহস্য (বিখিয়ার কাছে পূর্বপুরুষের আত্মাটাই সত্যি, টেরোড্যাকটিলের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার কোনো দাম নেই ওর কাছে) যা প্রথমে ছিল ওর একার, তা এই বহিরাগতের সঙ্গে ভাগ করে গ্রহণ করতে হচ্ছে, এটা ওকে আঘাত দিয়েছে। কিন্তু এটাও ওর কাছে এখন অতীত পুরুষদের এক অমোঘ অনুজ্ঞা, যে পূর্বপুরুষের আত্মা শেষ যাত্রাপথে ওই বহিরাগত শরণম্। সে কারণে পুরণের কথা ও ঠেলতে পারে না।

পুরণ একমিনিট দাঁড়ায়। খুব শীঘ্রই পিরথা অধ্যায় সমাপ্ত হবে ওর জীবনে, অন্তত আক্ষরিক অর্থে। বাকি জীবনটাকে তো পিরথার প্রেক্ষিতেই মূল্যায়ন করে কাটাতে হবে। বস্তুত পিরথা ওকে লাথি মেরে এই নির্মম সত্য বুঝিয়েছে জল, রুটি, ভাত, আসলে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত দামি জিনিস, কোহিনুরের চেয়ে দামি এবং তাকে অপচয় বা যথেচ্ছ নষ্ট করার অধিকার কারো নেই। সে রকমই দামি মাথার ওপর ছাদ, পরনের কাপড়, অ-আ-ক-খ, রোগে ওষুধ। পাঁচশো জনকে অনশনে রেখে একজন ভরপেট খায়, ছয়শো জনকে নিরক্ষর রেখে একজন বি. এ. পাশ করে এবং কত শতকে গৃহহীন রেখে একজন অ্যাপার্টমেন্ট কেনে, এ রকম জটিল রেশিও। বিখিয়াদের অবস্থান থেকে কোনো রেশিও কষা হয়নি আজও। কম্পুটার, তথ্য দপ্তর, মিডিয়া, যে অবস্থান থেকে ব্যাপারটা দেখে, তাও বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ইচ্ছামতো। শিক্ষিত মানুষ যে চিন্তাবিমুখ, তাও এই ব্যবস্থারই অভিপ্রেতে। এ ব্যবস্থায় মৌলিক চিন্তাকে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে "বিনাশ যোগ্য বিপদ" মনে করা হয়। এ ব্যবস্থা মানুষের মাথার চিন্তাকোষ জবরদখল করে কখনো মানুষকে

দিয়ে ফরহ্যান্‌সে দাঁত মাজিয়ে নেয়, কখনো বলিয়ে নেয় ভারত সগৌরবে এগোচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি হবার পথে। আবার কখনো মাতিয়ে দেয় রাজ্যের নাম বদল করাই প্রথম কর্তব্য, এই রঙ্গলীলায়। ব্যবস্থা চায়, আর মানুষ "নাচ্‌ রহে কাঠপুতলি সমান"। কিন্তু রেশিওটা সর্বাগ্রে বিখিয়াদের শ্রেণী অবস্থান থেকে কষাই ছিল প্রথম কর্তব্য। সে সব না করেই স্বাধীনতার বয়স চল্লিশ হয়ে গেল।

বিখিয়া, তুই চাস না আমাদের এ ভয়ঙ্কর আবিষ্কার কেউ জানুক, কেননা তোর কাছে ও তোদের পূর্বপুরুষদের আত্মা। কেউ জানলেই ব্যাপারটির পবিত্রতা কলুষিত হয়ে যাবে।

বিখিয়া, আমি চাই না আমাদের এ ভয়ঙ্কর আবিষ্কার কেউ জানুক, কেননা জানালে কৌতূহলী পৃথিবীর মিডিয়া-আক্রমণ ঘটবে। তুই দূরদর্শনে প্রদর্শিত হবি, এবং ওই আত্মার সাবধানী বার্তা, পিরথার আদিবাসী সত্তার ভীষণ সংবাদ, সব কিছু প্রেক্ষিত হারাবে, বহু বিশ্লেষণে প্রমাণ হয়ে যাবে যে যা বক, তাই বোগেইনভিলিয়া। এবং বলা যায় না, পৃথিবীর সকল দেশ পিরথা থেকে সর্বত্র, শেষ অরণ্য, শেষ গুহা সর্বত্র তদন্ত চালাবে ভারতে কোথায় এখনো প্রাগৈতিহাসিক সময় ও প্রাণী লুকিয়ে আছে। সে আক্রমণ ঠেকানো যাবে না।

তুইও বিপন্ন, আমিও বিপন্ন। সেই গানের মতো,

হায় হায়! আঁধি এসেছে
হায় হায়! জমি চলে যাচ্ছে
হায় হায়! দেশ চলে যাচ্ছে
হায় হায়! জমি-দেশ-মানুষ ধুলো ধুলো হয়ে যাচ্ছে।
হায় হায়! বাতাস থেকে ধূলিকণা ধরে এনে কেমন করে
তাকে শস্যক্ষেত্র বানাব?
বানাব হারিয়ে যাওয়া দেশ?

আমরা ওইরকম বিপন্ন।

কিন্তু পূরণ শেষ অবধি বলে না কিছুই। এরা কি দ্বিভাষিক, এবং

হিন্দি বলে। পূরণও হিন্দিভাষী।

কিন্তু পূরণের হিন্দি ও এদের হিন্দি তো দুই জগতের। এখানে কেন, বিহারের জেলায় জেলায় পূরণের একই অভিজ্ঞতা। গুয়াতে গুলি চালনার পর এক নেতা দৃপ্ত ভাষণ দিলেন অগ্নিবর্ষী ভাষায়। সব শুনে মেলে রোতো সুমরাই বলল, ও কী বলল তা হিন্দিতে বুঝিয়ে দাও।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ চলে সমান্তরাল পথে। মিলিত হবার বিন্দু কোথাও নেই। ভাষাও শ্রেণীবিভক্ত। শোষক হোক, "হম্ গরিবোঁ কে লিয়ে" এমন রাজনীতিক ঝুনো পার্টি ম্যান হোক, প্রকৃত গরিব-দরদী ও শটিত সমাজব্যবস্থার বদল দরকার এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী অথচ "নো পার্টি ম্যান" হোক, তাদের হিন্দি-বাংলা-গুজরাটি ইত্যাদি অন্যান্য ভাষা, ওদের ভাষার সঙ্গে সমান্তরাল পথে হাঁটে। সমস্যাটি এমন বড়ো ও চিরস্থায়ী বলেই নালন্দার কিষাণ রামাবতার বলত, "এই রকমই ঘটনা। কা কিয়া যায় মহারাজ?" রামাবতার সকলকেই "মহারাজ" বলত, ওর ছাগলকেও।

পূরণ নিশ্বাস ফেলে।

—ঘুরে আসছি বিখিয়া।

পাঁচ

হরিশরণ খুবই বিমর্ষ, সেই সঙ্গেই ভেতরে উত্তেজিত এবং বেপরোয়া। এস. ডি. ও. একই রকম, শান্ত, সকল সদিচ্ছা শেষ অবধি মার খাবে তা জানার ফলে চাপা তিক্ত ব্যঙ্গে প্রখর। পূরণ বোঝে এক সৎ ও বিবেকী অফিসার জেনে গেছেন, যুদ্ধে নামলে পরাজিত হবেন, তবুও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেই রণক্ষেত্রে নামবেন বলে ঠিক করেছেন। বয়স হরিশরণের চেয়ে কম, তবু ইনি বৃদ্ধ, প্রাজ্ঞতায়। হরিশরণের বয়স বেশি, তবু সে এখনো বেপরোয়া হতে পারে। ছাত্র

জীবনে একবার ও "হেঁটেই ঘুরে আসি" বলে রেলে না চেপে হেঁটে বোধগয়া দেখে এসেছিল। বয়স বেড়েছে, কিন্তু এখনো ও জিদ্দি।

—পিরথা এখন ইজ্জতের লড়াই।

—আস্তে। আমরা চাই না কৌশলজীর লোকরা কোনো কথা জানুন।

—কৌশলজীর ক্ষমতা আছে, উনি যদি কাজ করেন তো করুন না।

—আই. টি ডি. পি. মৌজা। সরকার বলবে সরকার থাকতে বেসরকারি সংস্থা কাজ করবে কেন?

—সরকার তো করছে না।

—আমি আপনি করছি না।

—পিরথা ব্লকে এই পঞ্চে এমন হাল কি চলতেই থাকবে?

—উনি চেষ্টা করুন, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করি।

—কেমন করে? জমি যা আছে পাথুরে, ভেস্ট জমি থেকে ভাল জমি আদিবাসীকে কে দেবে? আর এখানে তেমন জমি কোথায়?

—ওরা তো অন্যত্র যাবে না।

—না।

—আর ব্যাপক হারে সবাই ঋণী।

—হ্যাঁ। মহাজন বসে আছে খাতা নিয়ে, ভালপুরায়, রাজৌরায়।

—আপনি একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন।

—কী ভাবব?

—বর্তমান সমস্যা খাদ্যের।

—ম্যাজিস্ট্রেট বলবেন না এটা একটা ক্রনিক ফেমিন এরিয়া। আর এটা ওঁকে দিয়ে বলাতে হলে পিরথা নিয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে।

—ফাইট দি ফেমিন অন ওয়ার ফুটিং?

—তাই তো অবস্থা।

ফাইট দি ফেমিন অন ওয়ার ফুটিং। প্রাথমিক গোদা সত্য, সবুজ বিপ্লবভূমি মধ্য প্রদেশের এক অণু, অত্যন্ত পশ্চাৎপদ আদিবাসী ইলাকায় "চির মন্বন্তর", তা বলতে দেবে না কেউ। যুদ্ধ! যুদ্ধ

আকাশে-মাটিতে-জলে ! খাদ্য কর্পোরেশনের গুদাম জায়গা অপ্রচুর বলে খাদ্য পচে যাবে কিন্তু সে খাদ্য পিরথা বা কালাহাণ্ডি বা কোরাপুটে কখনো পৌঁছবে না, পৌঁছয় না । খাদ্য যায় আফ্রিকায়, শ্রীলঙ্কায়, সার্ক সম্মেলনে যৌথ শস্য খামার গঠনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, দেওয়া হোক, সকলকে সব দাও, খাদ্যশস্য উৎপাদনে তোমার প্রচুর বাড়তি উৎপাদন যখন, একই সঙ্গে কেন কালাহাণ্ডি জেলা এবং মাইক্রো-ইলাকা পিরথা, কেন উত্তরবঙ্গে অরণ্য-বসতির গ্রামবাসীদের মাথা গোনো আদমসুমারিতে, "তফসিলী আদিবাসী নির্বাচনী কেন্দ্র" প্রস্তুতকালে, এবং কেন তাদের তৃষ্ণার জল থেকে চলার পথ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সব দায়িত্বের বেলা তখন তাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আনো না, আই. টি. ডি. পি. আওতায় আনো না, তখন হাত ধুয়ে ফেলে দাও ও বল, "ওরা অরণ্যমন্ত্রক অধীনে", যখন অরণ্যমন্ত্রক ওদের শুধু দাস-মজুর করে রাখে, "ফালতু" বলে খাটায়, দেয় না কিছুই, দেয় না কখনো । ঠিক একই নিয়মে ব্রাত্য করে রাখ উত্তরবঙ্গ ডুয়ার্সের আদিবাসীদের, যাদের গোনা হয়, (সংখ্যাটা নির্বাচনী কেন্দ্রের জন্যে দরকার) এবং তাদের বেলাও অ থেকে হ, প্রতিটি ন্যূনতম মানবিক দাবি পূরণ কর না, বল "চা-বাগান মালিকরা ওদের দেখবে" এবং বাগানমালিক বাগিচার কুলিদের মাথা পিছু তিরাশি পয়সা মঞ্জুর করে উনিশশো সাতাশিতে, যখন "শতাব্দীর অন্ত্যকাল পশ্চিম গগনে সূর্যে, দীর্ঘ ছায়া তার",—এবং বাগিচামালিক এ দুঃসহ ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে কেননা মালিকদের ঘাঁটায় না কোনো সরকার, চা-বাগিচার মালিক কোটিপতি হোক, ওই কুলিরা থাকুক খরচার খাতায় ; যখন আদিবাসী পরিচালিত একমাত্র চা-বাগান সোনালী সমবায়, গ্রাস করতে থাকে বেনাম ও ভুয়া মালিক এবং কৌশলী প্রশাসন নেয় দর্শকের নিরাপদ ও লাভজনক ভূমিকা । যখন রাঁচি ও পালামৌয়ের নাগেসিয়া আদিবাসীদের নাম বিহার রাজ্যের আদিবাসী-তালিকায় থাকে না সুমারির পর সুমারি, এবং আসাম ডুয়ার্স ও সমতলে অন্য রাজ্য থেকে দেড়শো বছর আগে

যাওয়া সাঁওতাল-ওরাও'-মুণ্ডা ও অন্যদের বেলা তারা "আদিবাসী" নয়, "জাতি।" (পূরণ যদি বই না পড়ত, এ তথ্য থাকত অজানিত)।

এটা বাস্তব ঘটনা। কে অনশনে মৃত, অর্ধমৃত, তিলে তিলে মৃত্যুমান আদিবাসীদের বেলা ওয়ার ফুটিংয়ে যুদ্ধ করে ওদের বাঁচাবে?

এস ডি ও বলেন, সব করুন।

আকাশের দিকে মুখ তুলে গলা মোছেন ও বলেন, কুয়া দিন, গাছ দিন, ছাগল দিন, মুরগি দিন, পিরথার মুখে জোড় বাঁধ দিন, ব্লকের কাজে ওদের লাগিয়ে মিনিমাম ওয়েজ দিন। চেষ্টা করুন। আমি লিখেছি, পিরথায় দুর্ভিক্ষাবস্থা চলছে, খরা নয়। তারপর কী হবে জানি না। কিন্তু আপনাকেও লেগে থাকতে হবে।

পরে শংকর পূরনকে বলেছিল এস. ডি ও. সরকার, ব্লক সরকার, সকলকে বদলি করে দেবে। ওরা যদি কিছু না করে, তবে থেকে যাবে, আর এক কুয়া কাটালে বদলি হয়ে যাবে। তার চেয়ে কিছু না করা ভালো।

—কেন শংকর কেন?

—ভালাই ওরা করতে পারবে না।

এবং এ কথা তো পরে সত্য হয় যে সেচবিভাগ পিরথায় জোড় বাঁধ দেবার বিরোধিতা না করেই "এটা বিভাগীয় ব্যাপার" বলে লালফিতা দিয়ে প্রস্তাবিত জোড় বাঁধকে নাগপাশে বেঁধে অকেজো করে দিয়েছিল।

'যেখানে দুর্ভিক্ষ নেই, সেখানে দুর্ভিক্ষ আবিষ্কার' করার অপরাধে এস. ডি. ও. প্রথমে, তারপর হরিশরণও তুরন্ত বদলি হয়ে যায়।

সে সব পরে হয়েছিল, পরে।

পরে কৌশলজীও হাল ছেড়ে দিয়েছিল, কেননা "ওখানে পাহাড় নেই" বলে শংকররা নামেনি সুদূর সমতলে, বাস করেনি কলোনিতে। পাহাড়ে বাস করার জন্যেই এত দুর্গতি, তবু ওরা নামেনি পাহাড় ছেড়ে, ত্যাগ করেনি পিরথাকে, এবং শংকরকে হরিশরণ যখন "খেতে

পেতে, বেঁচে যেতে, শিক্ষা পেতে" বলে ভীষণ বকেছিল, শংকর ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'এত ভেবো না সরকার। মরে যাচ্ছি আমরা, মানুষ কমে যাচ্ছে। এই কম কম মানুষের মতো খাজড়া গাছও আছে, আর বাওলার ফলবীজ খেতে তুমিই শিখিয়েছ, আর দেখ! তেমন শিশুও জন্মাচ্ছে না, জন্মালেও ছেলে মেয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পিরথার জন্যে তুমি এত ভেবো না, তুমি ভালো লোক, কষ্ট পেও না। তুমি কী করবে? পাহাড়ের নিচে ভালো জমি যে নেই।'

এ কথা শুনে হরিশরণ কেঁদেছিল।

ইন্দোরে বসে এ কথা হরিশরণই পরে লেখে পূরণকে। অন্তত পৌনে দু-বছর বাদে।

এখন হরিশরণ বলে, কৌশলজীর মাস্টার প্ল্যান কিছু আজকেই হয়ে যাবে না।

সে কথা না ভেবে আপনার কাজ করুন। এই যে পত্রকারজী! আপনি থাকুন। পিরথায় বৃষ্টি দরকার। অবশ্য বৃষ্টি এলেও প্রশাসনিক ঝামেলা। উপরমহলের একটাই সিদ্ধান্ত "ওটা দুর্ভিক্ষ নয় খরা।' এখন আপনি যে বৃষ্টি আনলেন, এর ফলে হয়ত সিদ্ধান্ত হবে, 'বৃষ্টি হয়েছে, অতএব খরাও নয়।" এতে আমাদের কী মুশকিল তাই বলুন।

—আমি তো বৃষ্টি আনিনি।

—আদিবাসীরা তাই বলছে বলে শুনলাম।

—আর কী বলছে?

—এ কথাও বলছে, যে বৃষ্টি আনে তার কিন্তু চলে যেতে নেই।

—বৃষ্টি তো হতই।

হরিশরণ বলে, ম্যান! লেট দেম হ্যাভ দেয়ার মিরাক্ল। ওরা মিরাক্ল চায়, আমার ঝুলিতে কিছু নেই। কালই রাজোরাতে একজন বলল, এক সন্ন্যাসী এসে পিরথায় বসে যজ্ঞ করতে রাজি আছেন এবং যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হবে তার গ্যারান্টি দিচ্ছেন, তবে ব্লক

সরকারকে খরচ দিতে হবে, দশ কিলো ঘি আরো কী কী।

এস. ডি. ও. বলেন, আনুন না।

—সার, আমি বললাম যে বিনা খরচেই আমার বন্ধু বৃষ্টি এনে দিয়েছে। তাতে সাধুর দালাল বলল, এসব জোচ্চোরদের জন্যেই সদ্ধর্মবানরা মার খায়। বিনা যজ্ঞে যদি বৃষ্টি আনে কেউ, লোক তো যজ্ঞ করাবে না।

এস. ডি. ও. বলেন, বিখিয়ার খবর কী?

হরিশরণ বলে, মুখ বন্ধই রেখেছে, তবে পুরণের সঙ্গে ভাব হয়েছে বলে শুনেছি।

—আপনারও কি অশৌচ লেগেছে পত্রকার?

—অশৌচ? কেন?

দাড়ি গোঁফ, চুল রুক্ষ, খালি পা, পরনে লুঙি—বিপজ্জনক। প্রথমে আনেন বৃষ্টি, পরে চেহারায় পড়ে অশৌচের ছাপ। এরপর এখান থেকে চলে গেলে ওদের সঙ্গে খুবই বেইমানি করা হবে। থেকে যান।

—মিথ্যে আবেগ দেখিয়ে থাকলাম, তারপর খাজড়ার কন্দ, এই খরা আর দুর্গতি সহ্য করতে না পেরে চলে গেলে আরো বেইমানি করা হবে।

—পত্রকার বুদ্ধিমান হরিশরণজী! উনি জানেন যে আদিবাসীদের মনে কোনো আশা জাগাতে নেই, কেননা শেষ অবধি কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা খুব কঠিন।

—সিধা বলেটলে স্বীকার করলে কঠিন নয়।

—যেমন?

—আমি তখন ছোট। বাবার বন্ধু, অ্যানথ্রোপলজির এম এ. এক ভদ্রলোক, আমাদের 'আংকল' দণ্ডকারণ্যে চাকরি পান। খুব সৎ, খুব কর্মঠ, বিদ্যোৎসাহী, অন্যত্র আদিবাসী এলাকায় কাজ করেছেন। তবে বেশি কাজ ও'র হিমালয় এলাকায়, যেখানে লোকজন সর্বদা গা ঢেকে পোশাক পরে।

—পোশাকের কথা দিয়ে কী হবে ?

—আছে, কারণ আছে। তারপর উনি গেলেন দণ্ডকারণ্যে। খুব রক্ষণশীল বাড়ির ছেলে, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ট্যুরে নিয়ম মানা যেত না বলে ঘরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করে নিতেন। তা, সেবার এমন কোনো এলাকায় যান, বুঝে নিন, সেখানে মেয়েরা উপরে কিছু পরত না, কোমর থেকে ঢাকা থাকত। উনি জানতেন যে ওই আদিবাসী গোষ্ঠীর মেয়েরা ও রকমই পোশাক পরে। খুব বই পড়তেন তো। কিন্তু যেমন বাস্তবে দেখলেন, সেই অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন। চলে এলেন তিন মাস বাদে, কাজই ছেড়ে দিলেন। ডিপার্টমেন্টকে লিখলেন, ওরা খুব সরল ও নিষ্পাপ। কিন্তু ওদের মেয়েদের দেখে আমার ভয়ানক অসুবিধা হচ্ছে। আমি বুঝতে পেরেছি 'নগ্নতা' খুব পবিত্র ও নিষ্পাপ ব্যাপার, আর এটাও বুঝেছি ওই "নগ্নতা'কে ডাল-ভাত বলে মেনে নেব আমি নিজে এত সভ্য, সরল, পবিত্র বা নিষ্পাপ নই। তাহলে আমার মনে এত প্রতিক্রিয়া হল কেন ? কী ব্যাপার কৌশলজী ?

—ভি ডি. ও. ফিল্ম তুলবে, আসুন।

—না না, আপনারাই যথেষ্ট।

এস. ডি ও. বলেন, এ কি ?

সহসা ওখানে একটা মৃদু গোলমাল বাধে। দিমাগের বউ কী বলছে, শংকর এগিয়ে যায়।

—চলুন তো শুনি।

· ফিলিম ন উঠাহো সরকার !

—আরে, তোমাদের কথা তো জানাতে হবে, নইলে মানুষ জানবে কী করে ?

—ন উঠাহো সরকার।

—কী আশ্চর্য ! হরিশরণজী ! এদিকে····

এস ডি· ও· বলেন, যান। এটা আপনার ব্যাপার।

হরিশরণ এগিয়ে যায়।

—কী হল মতিয়ার মা ?

দিমাগের বউ এবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, মতিয়ার মা কেন বলবে ? মতিয়া কোথায় ? আবার ফিলিম উঠাও, আবার লোক আসবে, আকাল চলছে জেনে যাবে, আবার টারাক আসবে। স—ব বাচ্চা নিয়ে চলে যাবে।

কৌশলজী ক্রুদ্ধ, এবং এখন বোঝা যায় যে উনি যে-কোনো সময়ে ক্যাম্প তুলে নিয়ে চলে যেতে পারেন। ঠিক আছে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে, দুর্ভিক্ষ হয়নি, সেটা সরকার বুঝুক। উনি দুঃখী মানুষের ত্রাণে এসেছেন, কাজ করছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ বা খরা, বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা বা ঔদাসীন্যের ব্যাপারটা এবং কৌশলজীর ভূমিকা এবং মানুষের দুর্গতি, এটা তথ্যচিত্রে ধরে ফেলা দরকার। জনমত তৈরি হবে, এবং ত্রাণে সাহায্য আসবে, বস্তুত পৃথিবীর অন্য দেশেও মানুষ ও সংগঠন আছে যারা তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের কথা ভাবে। নিকারাগুয়া বিষয়ে বিশ্বে জনমত গড়ার জন্যে প্রচুর ছবি তোলা হয়। এটা সত্যি যে পিরথা কাহিনী নিকারাগুয়া কেন, কালাহাণ্ডির ম্যাপের কাছেও আসে না (কৌশলজীর বহু জায়গায় স্বদেশে বিদেশে ভাষণ দানে দক্ষ গলায় একটু আফসোস ধ্বনিত হয়) পিরথা, কিন্তু এর দলিলীকরণ প্রয়োজন। এখানেই তিনি, তাঁর সদিচ্ছাকে যারা ভুল বুঝছে, তাদের জানাতে চান, তাঁর ইচ্ছা যদি সফল হয়, তাহলে পিরথার দুর্গতদের পাথুরে পাহাড় থেকে সমতলের সবুজে নিয়ে যাবেন তিনি, সেখানে থাকবার মতো ঘর, স্নান-পান ও সেচের জল, চাষের সহায়তা ও জমি, মেয়েদের জন্য তাঁর প্রশিক্ষণ, ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের জন্যে স্কুল, চিকিৎসাব্যবস্থা সবই থাকবে, এরা মানুষের মতো বাঁচবে। এদের সেবার জন্য খাদ্যের মতোই দরকার এই ভি ডি. ও. চিত্র। এটি কোনো শিশুক্রেতা দেখবে না, দেখবে তারাই, যাদের দেখা দরকার। সরকার অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে গেছে, এবং সুখী হয়ে গেছে পাশ্চাত্যের মানুষ।

এস ডি. ও আস্তে বলেন, ভারতের টাকা, ক্রোনার-পশ্চিম জার্মানীর মার্ক-ডলার-ফ্রাঁ-পাউন্ড, এত টাকার গরম কি। হরিশরণজী

কী বলেন ?

শংকর সরপঞ্চের দিকে তাকায়। সরপঞ্চ কি কিছু বলবে ? কিন্তু সরপঞ্চ বিভ্রান্ত ও নীরব।

শংকর হরিশরণের দিকে তাকায়! সরকার! তুমিই তো এনেছ এদের, এখন কি তুমিও থাকবে নিরাপদ দূরত্বে ? না আমাকে দিয়ে বলাবে যে আমরা আত্মসমর্পণ করছি। ওর চোখ হরিশরণকে প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞতায় বলে দেয়, বুঝেছি সরকার। শেষ অবধি সবই বেওসা হয়ে যায়, ক্ষুধার্তকে অন্নদানও। ও'র অন্ন খাচ্ছি এ মুহূর্তে, তার বদলে উনি আমাদের ফিলমে ধরে রাখবেন। ক্ষুধার্তের আত্মসম্মান ওর অভিধানে থাকতে নেই।

ও হাত তোলে। শুকনো গলায় বলে, মতিয়ার মা বুঝাতে পারে নি আপনাকে। আমরা এখন অশৌচ অবস্থায় আছি। আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মারা আমাদের উপর বিরূপ হয়ে আছেন। এ অবস্থায় ছবি উঠালে আমাদের বিশ্বাসে আঘাত লাগে।

—এটা বিশ্বাসের কথা নয়।

—বুঝেছি। উঠান ছবি। মতিয়ার মা! আর বাধা দিও না, আমাদের তো কিছু করার নেই। সরকার আদিবাসীকে যদি দেখত, তাহলে কেমন করে আজ····

এখন ছবি উঠতে থাকে। মেয়েরা ছেঁড়া আঁচলে মুখ ঢাকে। পুরুষরা মুখ ফেরায়। একটি বৃদ্ধা এক কঙ্কাল শিশুকে জাপটে ধরে বাটিতে খিচুড়ি নিচ্ছে, এ দৃশ্যটি খুব ভালো তোলা যায় এবং টেপরেকর্ডার সামনে ধরলে বুড়ির গলার ঘড়ঘড় শব্দ ও অস্পষ্ট কথাও বন্দী করা যায়, শিশুর গলার চিঁচিঁ আওয়াজ।

—পরবর্তী শো জেনেভায়!

হরিশরণ আস্তে বলে।

এস ডি. ও. মাথা নাড়েন।

—গোড়ার কথায় ফিরে আসুন। সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যর্থ।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ঢেলে টাকা দিচ্ছে, এবং এটা ঘটনা যে অধিকাংশ কর্মঠ সংস্থার পিছনেই থাকে বিদেশী টাকা যা দেশী টাকার সঙ্গে সহাবস্থান করে। বস্তুত, এ সব কচকচি উঠবে বলেই···পত্রকার?

—পরে বলব।

এ বিষয় বলার বা কী আছে। জনসেবার্থে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে বিদেশী টাকার অনুপ্রবেশ, সে কি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি জানে না? এটা তারা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা তাদের লক্ষ প্রকল্প ও কোটি কোটি টাকা ও কয়েক লক্ষ সরকারি কর্মচারী ও পঞ্চায়েত সত্ত্বেও কিছুই পৌঁছয় না প্রকৃত প্রাপকের কাছে। আদিবাসী সমেত দরিদ্রদের দারিদ্র্যমোচনের জন্য এই যে টাকার সমুদ্র বহে যায়, তার কোনো প্রতিফলন নেই গরিব ভারতের আদিবাসী অ-আদিবাসী মানব-মানচিত্রে। নামে এত সংরক্ষণ যা আসলে ধাপ্পা, কেননা আদিবাসী পি আর ও; কম্প্যুটারবিদ; সমুদ্র-জীববিজ্ঞানী; পারমাণবিক পদার্থবিদ কজন তৈরি হয়েছে চল্লিশ বছরে; তাদের জন্যে সংরক্ষিত ওই সব পদে শেষ অবধি কারা পায় কাজ? তারা তো উচ্চশিক্ষায় যায় কোটিতে গোটিক, এক মুঠো ডাক্তার বা উকিল হলেও হয়, নইলে ওরা যায় হিউম্যানিটিজ শিক্ষাধারায়, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য ধারায় নয়, তাও কোটিতে গোটিক। গরিবি হটাচ্ছে কেন্দ্র এবং সকল রাজ্য, আর দারিদ্র্য বাড়বে, বাড়ছে। যেমন কাজ ওরা করতে পারে, তাতেও ডাক পায় না। শিক্ষকতায় বাণিজ্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, রাজনীতিক বিজ্ঞান, অর্থনীতিতে সংরক্ষণ তফসিলী আদিবাসীর এবং বাংলা ইংরাজি ইতিহাস জাতিসমূহের জন্য, যাতে সর্বত্রই জাতিসমূহ চাকরি পায়। "কেননা উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন আদিবাসী প্রার্থী পাওয়া যায় না"। এই যখন সমগ্র ফিল্‌ম সিরিয়াল, তখন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে স্বীকৃতি দিতেই হয় এবং প্যাথলজি করতে গেলে বেরোতে থাকে বিদেশী টাকা। বিদেশী টাকা পুষ্ট সংগঠনগুলি ব্যতীত তেমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও বড় কম যারা গরিবের জন্য কিছু

করবে। এ বাস্তবতা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি মেনে নিয়েছে। এই যখন ঘটনা, তখন এস. ডি ও-র এমন ছুঁৎমার্গপনা অবাস্তব। সরকারের হাতে সকল ক্ষমতা, এবং এক বিশাল অঙ্কের ব্যয়িত টাকার কোনো প্রতিফলন নেই গরিব ভারতের মানব-মানচিত্রে। গরু যে খাচ্ছে, দুধের পরিমাণ তার প্রতিফলন, চাষে যে উন্নততর উপায় প্রযুক্ত হচ্ছে, শস্যের অধিকতর উৎপাদনে তার প্রতিফলন, কিন্তু পিরথার আদিবাসী ব্লকের জন্য যত টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে রাজ্যকে, রাজ্য পাঠাচ্ছে ব্লকে (কাগজে), এই যাবজ্জীবন অনশন দণ্ডে দণ্ডিত আদিবাসী ইলাকায় তার কোনো প্রতিফলন নেই। সরকারী তথ্যচিত্রে কারা সাজে স্বাস্থ্যবান, সুখী, হাস্যমুখ আদিবাসী কৃষক দম্পতি? কারা বলে, একটি বাচ্চা, তাই আমরা গড়ে তুলেছি সুখী পরিবার?

পূরণ বলে, আমি যাই।

এস. ডি ও. বলেন, বিখিয়ার ছবি নিয়ে লিখবেন না?

—না। ওটা ওদের ব্যাপার।

—পত্রকার আপনি, কৌতূহল হল না?

—ওদের পূর্বপুরুষের আত্মা, আমার নয়।

—আর এ আকাল?

—সম্ভবত রাজ্য থেকে জেলা এবং মহকুমা আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের আমূল ব্যর্থতা বা হৃদয়হীনতা প্রথম অপরাধী।

—বাস্!

—অপরাধী ওরাও। বিলুপ্ত করার এত আয়োজন সত্ত্বেও বিলুপ্ত হল না, দাম দেবে না? এখানে ওরা না থাকলে আপনারা কত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

হরিশরণ বলে, হ্যাঁ, লেখায় যেন এই কামড়টা থাকে।

—থাকবে। এ জায়গাটার জরিপ ম্যাপেও তো পিরথা দুই চোয়ালের মধ্যে। কামড় থাকবে না?

—তুমিও কৌশলজীর ফিল্মের জন্যে খেপে গেছ।

—কী আশ্চর্য ! আমার খেপার কী অধিকার আছে ? ফিল্মও উনি তুলবেন। এত ত্রাণ, এত আয়োজন, তার কামড় থাকবে না ?

—ম্যান ! শংকরদের চোখ দেখছ না ? ওরা আবার ভিতরে গুটিয়ে যাচ্ছে। এটাই হল মুশকিল। মিশছি, কথা বলছি, কিন্তু কখনো ওরা আমাদের বিশ্বাস করছে না।

—বিতর্কের, আলোচনার বিষয়।

—ওরা চটে গেছে।

—হরিশরণ ! ছেলেমানুষী কোরো না। একে এই পরিস্থিতি, তারপর কৌশলজীর কথাবার্তা দেখছ না ? কথার ধরনেই বোঝা যাচ্ছে যে সরকারি ব্যর্থতাকেও দোষ দিচ্ছেন, ওঁর কৌশল-মেথড অনেক ফলপ্রসূ তা বুঝাচ্ছেন, এবং আদিবাসীরা যে কিছুই জানে না, ওদের সব কিছুই খুব অনুন্নত, খুব অসভ্য, এবং এ সব বর্জন করলে তবে ওঁরা ওঁর প্রস্তাবিত কলোনিতে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করবে, এটাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ওদের অনশন সত্য, ত্রাণ শিবির ওদের নিশ্চিত মৃত্যুকে খানিক ঠেকাল তাও সত্য। কিন্তু তা বলে ওদের কৃতজ্ঞ হতে হবে, ভাল লাগতে হবে, এটা বড্ড বেশি আশা করছ তুমি।

—সেই তো পুরনো জায়গায় ফিরে গেলে বন্ধু ! কিন্তু তুমি যেন ওদের খুব বুঝে ফেলেছ ?

—মৃত লোকের ঘরে আছি, আমারও অশৌচ তো।

এস ডি. ও, বলেন, আপনি খাচ্ছেন তো ঠিক মতো ?

হরিশরণ বলে, এ দেখছি সুরজপ্রতাপের মতো নয়, উলটা কেস। দেখো ম্যান, আরেক রকমে পাগল হয়ো না। সবাই বলবে, পিরথা সেই জায়গা যেখানে গেলে পত্রকাররা পাগল হয়ে যায়।

দু-জনের কথাতেই ঈষৎ হাসে পূরণ ও বলে, আমি চললাম। রিপোর্ট লিখব, নোট তো করব ?

এস. ডি. ও বলেন, এটাও লিখবেন নোটে, যে কৌশলজী পিরথা কুণ্ডী ও পাহাড় নিয়ে পিকনিক স্পট বানাতে চান।

হরিশরণ মাথা নাড়ে বারবার।

পূরণ বলে, কেন এই আই. টি. ডি. পি. মৌজায় কোনো প্রকল্প আসেনি, কাজ হয়নি, আপনাদের সে বিষয়ে কী বক্তব্য তাও জানতে হবে। ব্যাপারটা খুব জটিল, তাই না?

—আসবেন। সব জানাব।

চারদিকে তাকায় পূরণ, বলে, সাম্পল ট্রাইবাল ইনডিয়া, এক পিরথা প্যাকেজে। বহোত তাজ্জব।

পূরণ চলে যায়।

এস ডি ও. বলে, থেকে যাবে নাকি?

হরিশরণ বলে, না না।

সরপঞ্চ এ সময়ে এগিয়ে আসে। উত্তেজিত।

—কী হল?

—ডেরহা, সাঙ্গাটোলি, মধোলা, পুনগড়, ওখানেও ক্যাম্প খুলতে হবে সরকার। হুকুম দিয়া যায়। ওখানে কি শিবির হবে না? আকাল তো ওখানেও।

এস. ডি ও বলেন, হবে। নিশ্চয় হবে। ব্লক থেকে হবে। মধোলা ব্লক কী করছে?

—সেখানে তো বি. ডি. সরকার তিন বছর নেই সরকার। আর সরপঞ্চ হাসপাতালে।

—তবুও হবে।

হরিশরণ বলে, আপনি সাউথের এস ডি. ও. কে নিয়ে একটা ট্যুর লাগান। যাবার কালেও কিছু নিয়ে যাবেন। আর ওখানেও তো····

—হ্যাঁ, কৌশলজীর সংগঠন সেখানেও।

—তারিফ করতে হয় যে জেলার অনেক জায়গায় ও'র সংগঠন আছে।

এস. ডি. ও নিশ্বাস ফেলেন।

—কেন থাকবে না জী? সবই তো ছিল ছোট বড় রাজা নবাবদের রাজত্ব, গোটা মধ্যপ্রদেশটাই। ও'র পরিবার এ জেলায় কত জায়গায়

কাছারি রাখত। মধোলা ওদের তালুকায় ছিল। যেখানে যেখানে তালুকা ছিল, সেখানে সেখানেই····

—আমি এত জানি না।

—যেখানেই রাজাগজা ছিল সে সব জায়গাতেই····হবে সরপঞ্চ, হবে একটা ব্যবস্থা।

—মধোলাতে আমার মেয়ে থাকে। জামাই মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছে! জন যুবা দল এসে গেছে। বলছে, যার আছে তার কাছ থেকে কোদো মকাই নেব, আর সবাইকে বেটে দেব।

—তাদের নেতা মধু সিং কোথায়?

—ভূপালে। এ সব করলে ঝামেলা হবে সরকার।

—না না, কী ঝামেলা? ওরা তো কেড়েও নেয় না, মারদাঙ্গাও করে না, শুদ্ধিযজ্ঞ করে, লিফলেট বিলায়।

হরিশরণ বলে, না, এবার একটা মীমাংসা হয়ে যাক।

—হরিশরণজী! যত জানাজানি হবে তত বাধা নামবে। এর মধ্যেই যা পারেন করে নিন।

কৌশলজী বলেন, দুঃখী যেখানে আমরা সেখানে। সেটা আপনারা বুঝুন। সহযোগিতা করুন।

—আপনার সংগঠন ওখানে কাজ করছে না?

—অন্য কাজ করছে, ত্রাণের কাজও করবে। কিন্তু এটা সমস্যার সমাধান নয়। স্থায়ী ব্যবস্থা দরকার। আমাকে সুযোগ দিন, আমি কাজ দেখাব। আমার কর্মীরা অন্যরকম। ওরা চাকরি করতে আসেনি সরকারি লোকের মতো। আদিবাসীদের টাকা তো খাচ্ছে সরকারের লোক আর ঠেকেদার।

এ কথা বলে কৌশলজী ওদের দিকে তাকান। ওঁর ভাইয়ের ঠেকেদারি ফার্মই পেয়ে থাকে মাধোপুরার সরকারি ঠেকেদারি। হরিশরণ ও এস. ডি. ও. তাকে ঠেকিয়ে রাখছিলেন বলেই তাঁর ক্রোধ। কিন্তু এখন সব হয়ে যাবে। কৌশলজী এইসব হরিশরণ

আর এস. ডি. ও-র থেকে অনেক ক্ষমতাশালী।

—কাল আমরা কাপড় আনব।

উনি চলে গেলে হরিশরণ বলে, কুয়া শুরু করে দেব, আর ছাগল মুরগি কিছু....

—যা করবেন, ঝটপট।

—পুরণকে কী বলা যাবে?

—সত্যি কথাই বলবেন। পত্রকার লোকেরা বুঝেন। ও'রা সত্যি কথা জানতে চাইবেন।

—পুরণও কেমন হয়ে গেল ক'দিনে।

—হয়, হঠাৎ এমন হয়। চলি।

যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলেন, আমাকেও তো আত্মপক্ষ সমর্থনে নোট তৈরি করতে হবে। বিহারের পত্রকার জানাল, তারপর আমি জানলাম, সেটা তো হতে পারে না।

—হ্যাঁ সার। কিন্তু মধোলা....

—হ্যাঁ। যাক! সেখানে তো ওরা অশৌচে নেই।

সরপঞ্চ বিপন্ন বিস্ময়ে বলে, কেন থাকবে না সরকার? আদিবাসী ইলাকা, আদিবাসী টোলি, কাছাকাছি সবাই জানে, অশৌচও হয়ে আছে।

—ওরা তো কিছু দেখেনি।

—তাতে কী? কী করে বুঝাই...

শংকর এগিয়ে আসে, "আর না বুঝাও সরপঞ্চজী! এখন ওদিকে যাও। মাহি আর দিমান আর লুঢ়ি তোমাকে ডাকছে। ওদের নাম তুমি লেখাওনি এখনো। নমস্তে সরকার!"

শংকর হাঁটা থামায় না।

এস. ডি. ও. হরিশরণের দিকে তাকায়।

—আপনারই যত দুর্ভোগ।

—হ্যাঁ সার।

কিছুটা এগিয়ে শংকর থেমে যায়। পথ ছেড়ে একটু নামে।

হরিশরণ জানে ওখানে কী আছে। পাহাড়ের ঢালে, দুটি পাহাড়ের মাঝে ও নিচে (পাহাড় এখানে নাতিউচ্চ, টিলা বললে হয়), সমতলে, কাঁকুরে মাটিতে ওদের জায়গা-জমিন। কাঁটা মনসার বেড়া দিয়ে ভাগ করা। জমি এখানে, জমি পিরথা নালার পাশে, ছোট ছোট ভাগে জমি, এক লপ্তে এক একর বুঝি কারোই নেই।

- কী দেখছ শংকর ?

— সরকার ?

—কী দেখছ ?

শংকর বলে, জমিন ।

—সেচ পেলে কী হয় দেখা যাক। সেচ তো পায়নি কখনো। জমিতেই যদি মাঠকুয়া হয়····

—হাঁ সরকার····

শংকর মাথা নাড়ে। এগিয়ে যায়। ওর চোখ দেখে বোঝা যায় ও কোনো গুহার মধ্যে ঢুকে গেছে আবার। ভি ডি. ও. ছবি তোলার ব্যাপারটি ওকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

হরিশরণ শিবিরের দিকে এগোয়। এ সময়ে সর্বদাই তার থাকার দরকার। কৌশলজীর জন্যে। যদিও পূরণের জন্যে উদ্বেগ লেগে থাকে মনে এবং শংকর যে আবার ওর কাছে মায়ামৃগ হয়ে যাচ্ছে, তাতেও বেদনা লাগে। ম্যাজিস্ট্রেট বলে থাকেন, আদিবাসীরা খুবই অকৃতজ্ঞ এবং সরকার যে কত করছে তা বোঝে না।

হরিশরণ আজ সরপঞ্চকে এনে দিয়েছে. "কুষ্ঠ রোগ সময়ে ধরা পড়লে সেরে যায়। নিকটের কুষ্ঠ হাসপাতালে চলে যান" লেখা পোস্টার। এর কাগজ ভাল, বেশ বড়সড়। জনতা রায় দিয়েছে এমন কাগজ সরকার দিচ্ছে, এ এক সাহারা। ঘাসের আগড়ে এমন কাগজ লাগিয়ে নিলে ভাল আটকাবে বাতাস। মেয়েরা বলছে এতে বাচ্চা শোয়ানো যায়। রিলিফের খাদ্যশস্য বেছে নেওয়া যায়। এর উপকার বহুমুখী। সরকারি ইস্তাহার এই একমাত্র উপায়ে গরীবের সেবা করে।

হরিশরণ ভাবে, কে করবে পরিবার-পরিকল্পনা ? আর দেশের শান্তি ও মৈত্রী অক্ষুণ্ণ এরা রাখছে বিলোপ পেতে পেতে, আজ যার অন্ন জোটে না, সে সারা ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা রোখবার কতটুকু দায়িত্ব নেবে, যখন রাজোরা ব্লক ঘেরে শংকররা (তার আমলে নয়, কী ভাগ্য !) "সরকার ! বীজ দাও, বীজ দাও তাই খাব" বলে ধন্না দিয়েই ব্লকের আইন-শৃংখলা বিপন্ন করেছিল ? আর কুষ্ঠ হাসপাতাল ! কোনো হাসপাতালই নেই কাছে। রোগে ভোগে সরপঞ্চ বা কোনো গ্রামীণ চিকিৎসক বা গুনিন ভরসা। এসব পোস্টার ঠিক ভাবেই ব্যবহার হচ্ছে।

—এ সরপঞ্চজী ! পত্রকারকে কিছু দিও।

পূরণ মাটিতে চাটিতে শুচ্ছে, ছাতু খাচ্ছে, আশ্চর্য ! গেঞ্জি লুঙি গামছা রোজ সাবানে কাচত।

পূরণ আর বিখিয়া, একই বিপন্ন উদ্বেগে গুহার সন্ধানে গিয়েছিল। পূরণের হাতে টর্চ, গামছা মোড়ানো, বিখিয়ার হাতে লাঠি।

পিরথার কুন্ডীর জলে তীরের আশপাশের বাবলা বনের ছায়া। জলটি খানিক সবুজ, খানিকটা রোদে স্বচ্ছ। নিচে শ্যাওলা পিছল পাথর, জলে কোমর ডুবে যায়। কুন্ডী পেরিয়ে নালার বুক ধরে উজানে হেঁটে গেলে বোঝা যায় পিরথা পাহাড় কম বিস্তৃত নয়। অনেকটা জুড়ে এ পাহাড়টি আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। পাথরের ফাটলের লম্বা লম্বা ঘাসের গোড়া খুব শক্ত।

পশ্চিমঘাটেও এমনই ঘাস দেখেছে পূরণ। তবে বর্ষার পর পশ্চিম ঘাটের চূড়ায় ও গায়ে ছিল সুমিষ্ট, অম্লমধুর বুনো ফলের গাছ, ওখানকার গরিবের খাদ্য, আর ছিল অসংখ্য ঝরনা।

এখানে পাহাড়ের চেহারা আদিম, ভূ-বিন্যাস অন্যরকম, কঠোর ও পরুষ। বুনো ফলের গাছ নেই, নেই পশ্চিমঘাটের মতো গন্ধহীন শাদা ফুলের গাছ। খানিকটা হেঁটে বিখিয়া ঝুলে থাকা ঘাস ধরে ওঠে এক

গুহামুখে এবং পুরণকেও ইঙ্গিতে জানায়. এমনি করেই উঠে এসো।

গামছাটি কোমরে বেঁধে পূরণ উঠে আসে। বুকের ভিতর ঢোমরা বাজে যেন. উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ড এমন আছড়ায়।

টর্চ ফেলে ও, দেখে দেখে মাথা নিচু করে বিখিয়ার সঙ্গে এগোয় এবং একটি সুপরিসর গুহায় ঢুকে হঠাৎ রোদ পায়। একদিকে রোদ পড়ছে উপরের ফাটল থেকে।

বিখিয়ার অঙ্গুলি নির্দেশে পূরণ দেওয়ালে টর্চ ফেলে। সুমসৃণ পাথর থেকে ঢোমরা বাজে, নাচের কোলাহল।

খুব সযত্নে কতদিন ধরে কে খোদাই করেছে নৃত্যপর নরনারী, ঢোমরা, বাঁশি, তাল বাজাবার খোকসার? ময়ূর, হাতি, হরিণ, পাখি, সাপ, উলঙ্গ শিশু, গাছ, খাজড়া গাছ, তীর ও ধনুক, বর্শা।

মানুষরা বড় বড়, পশু পাখি ছোট ছোট, গাছপালা বড়ো বড়ো। দেয়াল জোড়া এত ছবি কারা কতদিনে খোদাই করেছিল?

এ ছবি কি সেই সময়ের যখন বিখিয়ারা ছিল স্বাধীন, আর জীব জগৎ ছিল তাদের কাছে অধীন, শিকারের প্রাণী? যখন অরণ্য ছিল জননী, পালয়িত্রী?

—তুইও এঁকেছিস?

বিখিয়া জবাব দেয় না। পুরুষদের কানে অলঙ্কার। মেয়েরা সালঙ্কৃতা, ওরা নাকি খয়ের কাঠের গয়না পরত এক কালে। এ ছবি কোন যুগের?

না বিখিয়ারাই এঁকে এঁকে সেই অতীত জীবনকে ধরে রাখে?

না, ছবি তুলবে না পূরণ। সে কোনো পবিত্রতাই অশুচি করবে না, মনে কোনো তাগিদ নেই।

বিখিয়া ওর হাত টেপে, ওর চোখ বলে, চলো চলো।

এবার ছাতহীন সুড়ঙ্গ ধরে নামো, নামো, নিচে, ঘুরে যাও, আবার ঢোকো একটি অন্ধকার গুহায়। এ গুহার উপর দিয়ে জলের শব্দ এবং মেঝে পিছল, টর্চ ফেলে দেখে দেখে চলো। বিখিয়া এখন লাঠি

ঠুকে শব্দ করে চলে। উপরের গুহা দিয়ে পিরথা বহে চলেছে। এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গমগম শব্দ। এরপর সংকীর্ণ এক পথ। আরো নামছে ওরা। তারপর বিখিয়া ওকে থামিয়ে দেয়।

উপরে ফাট দিয়ে রোদ পড়েছে। সামনে একটি গহ্বর। টর্চ ফেলে নিচটা দেখা যায় না. লাঠিটা ঝোলালে তল মেলে না।

বিখিয়া ও পূরণ দাঁড়িয়ে থাকে। হ্যাঁ সামনের এক অন্ধকার গহ্বর হয়ত পাহাড়ের ভিত অবধি নেমে গেছে। নিচে অন্ধকার যেন আঁচল পেতে অপেক্ষা করেই আছে। দাও. আমাকে দাও কী গোপন করবার আছে, আমি সযত্নে রক্ষা করব। এখন তো নিজস্ব, গোপন, রহস্যময়. কিছু নেই। যা কিছু নিজস্ব. সবই তো আক্রান্ত। জালের বেড় ঘেরা বন্যপ্রাণী কোথায় পালাবে? চারদিক থেকে ঘিরে আসা বর্তমানকাল অতীতকে খেয়ে নেবে নিঃশেষে। তবু তো থাকে গোপনে রক্ষা করবার মতো অমূল্য সত্য, যা কাউকে জানতে দেয়া চলে না। আমাকে দাও. আমি কালহীন, সময়হীন সেই সময়ের অন্ধকার, যখন পৃথিবী ছিল জলমগ্ন, আলো ছিল না কোথাও, সর্বত্র ছিল অন্ধকার, আর সৃষ্টিকর্তা ছিলেন চিন্তামগ্ন. কেমন করে সৃষ্টি করবেন পৃথিবী ও জীবলোক। তখন থেকে আমি অপেক্ষা করি, সবই রেখে দিই আমার কোলে, হারিয়ে যায় না কিছু।

একটি ছোট পাথর নিচে ফেলে বিখিয়া।

কয়েক সেকেণ্ড পরে পাথর পড়ার শব্দ হয়।

পূরণ ও বিখিয়া পরস্পরের দিকে তাকায়। এই ভালো বিখিয়া, এই ভালো। কেউ জানবে না।

—কেউ জানবে না।

বিখিয়া মাথা নত করে।

—তোর খোদাই করা ছবিটা···ঘের দিয়ে খাজড়া গাছ তুলে লাগিয়ে দিস···পাথর দিয়ে ঘেরে দিস···আস্তে আস্তে ঢেকে যাবে, তবু থাকবে। এই গুহায় কত ছবি তো কেমন রয়ে গেছে। কেউ

দেখেনি, রয়ে গেছে।

এবার ওরা পেছন ফেরে। এই পাহাড় হয়ত একদিন ওদের কাছে ছিল দুর্গ। গুহা তো আরো আছে। কোনো আক্রমণ ঠেকাতে ওরা এমন করে পাহাড়ের উপর ঘরকে মনে করেছিল নিরাপদ? ওদের আরণ্য বসতিতে ঢুকে পড়া অন্য জাতির পুজো-যজ্ঞ-তপ দেখে তখনি কি ওরা বুঝেছিল ওদের জাতিসত্তা-পুজা-বিশ্বাস-লোকাচারের উপর আক্রমণ আসছে। তাই কি নষ্ট করত যজ্ঞ? পালাত বনে? ওদের শাস্তি বিধানেই কি রঘুপতিরাঘব আসবেন বারবার? ওদের স্মৃতিতে ধরে রাখা কথা-ঐতিহ্য কী বলে, তা তো জানাই হল না। শুধু এক বৃদ্ধ সাঁওতাল একশো ষোল বছর আগে পূর্বপুরুষদের কথা যেমন বলেছিল (হরফ রোমান, ভাষা সাঁওতালি), পূর্বপুরুষগণ বলিয়াছেন জানা যায় পুরাকালে রাম রাজা থাকিবার সময়ে সমস্ত আদিম লোক তাঁহার সঙ্গে লঙ্কায় গিয়া রাবণ রাজাকে পরাজিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জানা যায় বড় কম, অজানিত অনাবিষ্কৃত রেখেই এক মহাদেশকে আমরা বিনষ্ট করলাম। আদিবাসী চায় মানুষের স্বীকৃতি, সম্মান, কেননা সে প্রাচীন সভ্যতার সন্তান। আমরা তাদের ভিখারি সাজায়ে এ কি মরণরঙ্গে মাতি, ভারতের বিজ্ঞান-শিল্প-কৃষি-প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নয়নে কোথাও তারা নেই। তারা থাকে দর্শক। ভারতবর্ষ চলে একোইশের দিকে।

যে পথ দিয়ে ওরা এসেছিল, সে পথ দিয়েই ফিরে যায় ওরা। এবং ঘাসের গোছা ধরে নামার কালে পূরণ বোঝে যে কতটা অসম্ভব (তার পক্ষে) কাজ করেছে। এবার পিরথার বুক ধরে এসে ওরা কুণ্ডীর জলে স্নান করে। হঠাৎ জল কালো দেখায়, কালো মেঘ চলে যাচ্ছে। হয়ত আবার বৃষ্টি হবে, কিন্তু পূরণ সে জল আনেনি। আর, সে তো কোথায় পড়েছে যে রাজস্থানে মরুকে সবুজ করলে ক্রমে বর্ষা হবে কৃপণ আর সবচেয়ে আগে আক্রান্ত হবে মধ্যপ্রদেশ।

স্নানের পর উঠে আসে ওরা। বিথিয়ার দিকে না চেয়েই প‍ূরণ বলে, দিনে ঘ‍ুমা। রাতে চলে আসিস।—নির‍ুত্তরে বিথিয়া চলে যায়।

আজ শংকর চলে আসে ওর ঘরে।

—কি সরকার, সত্ত‍ু খাচ্ছ ?

—আমিও সরকার ?

—না, 'বাব‍ু'।

একট‍ু চুপ করে থেকে ও বলে, তুমি তো অনেক ঘ‍ুরেছ। এখন আর কোথাও জঙ্গল, পাহাড় এমন নেই যার খবর এখনো কেউ জানে না ?

—আমি তো দেখিনি কোথাও। আর····শংকর····শ‍ুধ‍ু পাহাড় আঁকড়ে পড়ে থাকলে তোমরা কি বাঁচবে ?

—কোথায় গেলে বাঁচব ?

প‍ূরণ মাথা নাড়ে।

—তোমাদের সরকাররা তো বলছেন····

—হাঁ, বলছেন···

—এই জলের আসান হলে····

শংকর ঈষৎ হাসে।

—তবে তো হতই বাব‍ু।

—তুমি কিছ‍ু খেয়েছ ?

—রিলিফ! রিলিফ নাও, ফিলিম উঠাতে দাও। আমরা ভুখা নাঙ্গা গরিব। সে কথা ফিলিমে উঠে যাবে। কিন্তু কে আমাদের ভুখা নাঙ্গা গরিব করল, সে কথা তো ফিলিম বলবে না। আমরা তো ভিক্ষা করি না, ভিক্ষা চাই না, সে কথা কি ওই ছবি দেখে মান‍ুষ ব‍ুঝবে ? সবাই উঠালো ছবি, তুমি কি উঠালে ?

—শিবিরের তাঁব‍ুর। কৌশলজীর। আচ্ছা, নদীর দিকে কুয়া কাটলে তো জল পাও।

—কুয়া কাটলে····

—তোমাদের অশৌচ কি কাটবে না ?

—সে তো বিথিয়া জানে।

শংকর পবিত্র বিশ্বাসে বলে, বিথিয়া এখন সবার উপরে। ও তেল দেবে সকলকে, তবে তেলনাহান হবে। চুল দাড়ি নখ ফেলে আমরা স্নান করব, অশৌচ মুক্ত হব। ওই তো দেখেছিল....যা জানবার ওই জেনেছে আর ওকে দেখে আমরা জানলাম।

—এরপর ওর কী হবে ?

—ও তো বাঁধা হয়ে গেল বাবু, ওই পাথরকে পবিত্র রাখবে পুজো দেবে, এ জীবনে ওর মুক্তি নেই। আর ওই পাথর ! কেমন করে পিরথা ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে বলো ?

পিরথা পাহাড় ও নদীর আশ্রয় ওরা ছাড়ত না কিছুতে, এখন পাথরের ফলকটি ওদের না যাবার আরেক কারণ হয়ে গেল। পিরথা হয়তো শেষ আশ্রয়স্থল ছিল, অথবা ওদের রাজ্য, ওদের অতীত। এখন তাতেই ওই ফলক ! অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে গ্রথিত করার এক মিথ। এ ব্যাখ্যাটা বোধহয় ওদের হৃতপ্রায় জাতিসত্তার জন্যে দরকার। যাকে বর্তমান সময় কিছুই দেয় নি, তার কাছ থেকে মিথ, অলৌকিক, যা ওদের বোধিতে ইতিহাস অলিখিত, তা কেমন করে কেড়ে নেওয়া চলে ? কেউ সে অধিকার রাখে না।

—বাবু !

—বলো শংকর।

—ব্লক সরকারকে এ কথা বোলো !

—তুমিও বলতে পারো।

—না বাবু ! সে তো ভালো লোক, সে বুঝবে না, দুঃখ পাবে। আমার কথা তুমি বুঝবে না কি জানি না। সে তো বুঝবে না।

—তোমার কে আছে শংকর ?

—আমার ? সবাই আছে। বউ আর মেয়ে আর মা। সবাই একে একে পাথর বনে গেল। ছাই পুঁতে আমরা পাথর দিই !

শুনেছি, আগে পড়াতাম।

—এবার ?

—না বাবু। আকাল তো চলেই। ছেলেটা আছে আমার বোনের কাছে। ভালপুরায়।

—সে পড়ছে ?

বিস্মিত শংকর বলে, কেমন করে ? তিরিশ টাকা ধার। সে মহাজনের গাই চরায়, গোয়াল ঝাড়ে, গোবর ঘসি করে। চার বছর হল মহাজন হিসাব করে না। করলে ব্লক সরকার ছাড়িয়ে আনবে। সরকার বলে যে "হালি" এখন বে-কানুন। ছেলে আসলে মালিক কিছু করতে পারে না। কিন্তু সে তো ধরম হয় না বাবু। টাকা তো আমি নিয়েছিলাম। ওই সন্ধ্যায় ঘরে চলে আসে।

—ভগ্নীপতি কিছু করে ?

—বোন, ভগ্নীপতি দুজনেই…যখন যা পায়।

—তুমি ?

—যখন যা পাই। ছেলেটাকে ছাড়াব।

—পড়াবে না ?

শংকর গভীর স্নেহে বলে, ঘরে আনব। পড়বে কোথায় ? আর পড়বে বা কেন ? আমি তো পড়েছিলাম ছয় ক্লাস, আর আদিবাসী অফিসার, সরপঞ্চ বলেছিল আমার চাকরি হবে। চলি বাবু। তুমি এলে, শুধু কষ্ট পেয়ে গেলে, শীতকালে এসো।

—তখন আকাল থাকবে না ?

—তখন আমরা মালিকদের জমিতে কাজ পাই। খেত থেকে ঝরা পড়া ধান, মাড়োয়া আনি। বাবলা বনে পাখিও আসে। ওই এক-দেড় মাস। নইলে আকালই চলে। চলি বাবু।

নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আকালের কথা লিখলে কি বড় সরকার শুনবে ? যদি সব লিখে দাও ?

—আমি তো চেষ্টা করব।

—তুমিও চলে যাবে।

—যেতে তো হবেই।

—যে জল আনে, তার কিন্তু যেতে নেই, পরদাদারা বলত। তখনো একজন জল এনেছিল। আর এখানে থেকে গেল। শুনেছি বুড়ো হয়ে মরে যায়।

শংকর উঠে পড়ে।

—যতদিন কৌশলজী, তারপর ?

ছয়

পূরণ আর বিখিয়া বসেছিল গর্ভগৃহের মুখে। আজ মেঘ আছে, মেঘ জমছে আর জমছে। আবার বৃষ্টি আসুক, ভরে উঠুক মাটকুয়া, সরপঞ্চের বাঁধানো বড় ইঁদারা। জল কষ্টে সরপঞ্চই জল দেয়। গাবহিতে ওর বাড়ির সামনেই বড় পঞ্চায়েতী ইঁদারা। ইঁদারাটি করার সময়ে অনেক কথা ওঠে, যে এটা ও সুবিধা নিচ্ছে। কিন্তু ওখানেই জলের স্তর খানিক সহজে মেলে, তাই ইঁদারাটি হয়। ওই ইঁদারা থেকেই জল দেয় সরপঞ্চ, যদিও তার মোষেদেরও স্নান করায়। সে ইঁদারাও ভরুক, পিরথা, গাবহি, ঢোলকি, সব গ্রামই বড় পিপাসিত। আবার ডেরহা, সাঙ্গটোলি, মধোলা ও পুনগড়ে এদের জন্য যে সব ইঁদারা, তার জল বড় কটু, বিস্বাদ। বর্ষায় সে জলে কিছুটা স্বাদ হয়। বৃষ্টি আসুক।

বিখিয়ার অনাহার ও অশৌচ শীর্ণ মুখে চোখ দুটি নিষ্পলক। কোথায় ওকে দেখে বিখিয়া ছবি এঁকেছিল, আর তা জানতে চায় না পূরণ। পিরথা ওকে শিখিয়েছে, সব সময়ে পত্রকার হলেও সব প্রশ্ন করতে নেই।

বিখিয়া দেখছে, ওদের পূর্বপুরুষের আত্মা অবয়বী হয়ে উড়ে এসেছিল। একদিন, এখন সে কায়া ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে। সত্যিই যদি

তাই হত ? ব্রিজ ও পথ, নয়া নয়া জনপদ ও শস্যক্ষেত্রে, তার নিচে শায়িত, অবলুপ্ত জনপদের সমাধিক্ষেত্রের আদিবাসীদের ও কি বলে যেত, আমাদের উত্তরপুরুষ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাদের অস্তিত্ব বড়ই বিপন্ন। টিঁকে থাকতে হলে তাদের মিশে যেতে হবে মূল স্রোতে, যেখানে সামাজিক অবস্থান হবে নিচের তলায় এবং জাতিসত্তার কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকবে না। আবার পিরথার পাহাড় কামড়ে পড়ে থাকলেও তাদের মুক্তি নেই, তাদের দেশ, জমি সব ধুলো ধুলো হয়ে উড়ে গেছে বাতাসে। বাতাস থেকে ধূলিকণা ধরে এনে কে রচে নিতে পারে গ্রাম, অরণ্য শস্যক্ষেত্র ? বিথিয়ার চোখ অকম্প্র দীপ যেন, এই মহান মিথের মহান মৃত্যু ও দেখে নিতে চায় দু-চোখ ভরে।

পূরণ দেখছে তার নিজের ব্যর্থতা। প্রাক-ইতিহাসের ওপার থেকে ইতিহাস, মহাদেশীয় অপসৃতি, পৃথিবীতে বহু আলোড়নের পর ঋতু পরিবর্তন, মানব জাতির আগমন, আদিম ইতিহাস, প্রাচীন দেশগুলির ইতিহাস, মধ্যযুগ, বর্তমান যুগ, দুটো বিশ্বযুদ্ধ, সব দেখে, এখন পৃথিবীতে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও পারমাণবিক বিস্ফোরণের সন্ত্রাস, সব কিছু ডানার নিচে রেখে ও জানাতে এসেছিল কোনো তীব্র জরুরি সংবাদ। আধুনিক মানুষ পূরণ ওর চোখের বার্তা পড়তে পারল না। কিছু জানা যায় না। শেষ অবধি অনেক অবশ্য-জ্ঞেয় খবর না জেনেই চলে যেতে হয়। পূরণ কিছুই বুঝল না দেখে কাল থেকে ওর চোখ বন্ধ। শরীরটি আস্তে আস্তে যেন ডুবে যাচ্ছে, চার পায়ের উপর ধসে-পড়া শরীর, মাথা মেঝেতে, দেখতে দেখতে শরীরটি হঠাৎ থর থর করে কাঁপে। কাঁপতে থাকে, এবং সহসা খুলে যায় ডানা, আবার মুদিত হয়, এ কষ্ট দেখা যায় না চোখে। বিথিয়া বিড়বিড় করে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে কী বলে চলে। বলতে বলতে দুলতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক বাদে পূরণ বলে, নেই।

বিথিয়া স্থির।

বিখিয়া স্থির, অনড়, নিশ্চল।

বসে থাকে, ওরা দু-জন বসে থাকে।

অনন্ত সময় কেটে যায়। বিখিয়া সম্ভবত মনে মনে ওর পূর্ব পুরুষদের কাছে চলে যায়, তারপর অনন্ত সময় ধরে পাঁচ হাজার বছরের পথ পরিক্রমা করে ক্রমে ফিরে আসে। যেন সমুদ্রে চলে গিয়েছিল ও নৌকা নিয়ে, সমুদ্র পরিক্রমা করে ফিরে এল, ফিরে আসছে, দেহ নড়ে ওঠে ওর। পূরণকে রেখে গিয়েছিল প্রতীক্ষায়, পূরণ শুধু দর্শক, নৌকা ভাসানো দেখল, নৌকায় প্রত্যাবর্তন দেখল, দর্শক তো দূর থেকেই দেখে, সে রাখে না জলের খবর।

তারপর বিখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। পূরণকে হাত নেড়ে চলে যেতে বলে।

পূরণ বাইরে গিয়ে বসে।

বিখিয়া আজ সন্ধ্যার আগেই এনেছিল অনেক কিছু। ও এসে একটি ঘাসে বোনা বড় ডালা নিয়ে যায়।

অনেক পরে বাবলার পাতা ও ঘাসে ঢাকা ডালাটি নিয়ে ও বেরোয়। আকাশ ক্রমে পূবে ফ্যাকাশে হয়।

বিখিয়া চলতে থাকে। পূরণ চলে লাঠি ও টর্চ নিয়ে। এখন পাহাড় থেকে নেমে পিরথা কুণ্ডী। তারপর কুণ্ডী পেরিয়ে নদীর বুক ধরে উজানে গিয়ে আবার ঘুরে, অদ্ভুত একাগ্রতায় বিখিয়া ঝুড়িটি ধরে রেখেই একহাতে পাথর আঁকড়ে ঘাসের গোছা ধরে। পূরণ আস্তে বলে, আমি উঠি, টর্চ দেখাই।

বিখিয়া গুহাচিত্রগুলির সামনে দাঁড়িয়েছিল একবার। তারপর তো পথ আরো জটিল ছিল। কোনো সরীসৃপ সরে যায়, বাইরে কোনো রাতের পাখি ডাকে।

অনেক পরে ওরা সেই প্রতীক্ষমান অন্ধকারের কিনারায় পেঁছেছিল। অন্ধকারটি হাঁ করল।

ওরা স্নান করেছিল ব্রাহ্মমুহূর্তে।

তারপর বিখিয়া জল ভরে ভরে এনে ধুয়ে দেয় গর্ভগৃহ, নিশ্চিহ্ন, নৈর্ব্যক্তিক, হা হা শূন্যতা এসে ভরে দেয় ঘর। তারপর বৃষ্টি নামে। বিখিয়া আকাশ পানে মুখ তুলে জল খায়। আঙুল গোনে, পূরণের দিকে তাকায়।

এখন ওর গলা বৃষ্টিধারার মতো তাজা, ঝরঝর।

—পাঁচদিনে তেলনাহান।

—বিখিয়া!

বিখিয়া যেন সর্বজনমান্য প্রাচীন সমাজপতি।

—তারপর তুমি চলে যেও।

—আজও তো যেতে পারি।

বিখিয়া মাথা নাড়ে।

—পাঁচদিন ওই ঘরে থাকবে।

—তুমি?

—আমিও থাকব।

এখন বিখিয়ার চোখ বুঝিয়ে দেয় যে এই অদ্ভুত পরিস্থিতি ওদের এক করে দিয়েছিল, কিন্তু কখনই ওরা এক হয়নি। যেন অস্বাভাবিক এক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দুই ভিন্ন জগতের ও জীবনের মানুষ বাধ্য হয়েছিল কোনো তুষারখাত পার হতে অথবা অচেনা হিংস্র মরুভূমি পার হতে, তখন পরস্পরের সার্বিক সাহায্য ছিল দরকার। সংকটকাল ওদের কাছে এনেছিল। সংকটপর্বের অবসানে হাতে হাত থাকলেও দুজনে দুজগতের। এ তো শুধু দুই শ্রেণীর পৃথক অবস্থানে ফিরে যাওয়া নয়। দুই শ্রেণী, তারপর গরিব আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মূলস্রোত ও ওদের জীবনস্রোতের তফাত, গঙ্গা এবং পিরথা নালা। জীবনে জীবন যোগ করা হয়নি, এখন তো বিখিয়ার চোখ বিবিক্ত ও সুদূর হবেই। হাজার হলেও এ কথা সত্য যে, যা ছিল তাদের একান্ত সেখানে এই বহিরাগতকেও ঢুকতে দিতে হয়, বস্তুত ওদেরই মতো পূর্বপুরুষদের আত্মা, কিন্তু টিঁকে থাকার জন্য ওই বহিরাগতেরই শরণ

নেয়, তা হলে কি সমগ্র অভিজ্ঞতাটির সারাংশ এই দাঁড়ায় না, যে. লুপ্ত জনপদের লুপ্ত সমাধিক্ষেত্রে এবং পরলোকেও এখন তোমরা আক্রান্ত, মূলস্রোতের শরণ নেওয়াই ভরসা এবং সেইজন্যই সে পূরণের কাছেই আসে, বিখিয়ার কাছে নয়। পূরণকে সে আরো বড় কোনো বার্তা জানাচ্ছিল. যা পূরণ বোঝেনি। বিখিয়ার চোখ বলে দেয়, যেহেতু তুমি এ প্রসঙ্গে জড়িত. সেহেতু শেষ অবধি তোমাকে থেকে যেতে হবে। তার মানে এই নয় যে তুমি আমার কাছে বিগত কয়েকদিনের কামারাদোরি পাবে। তুমি তুমি থাকো, এবং আমি থাকি আমি এবং এই গুরুদশা কেটে গেলে যে-যার জীবনবৃত্তে চলে যাব।

বিখিয়ার পিঙ্গল রুক্ষ চুলে. গায়ে বৃষ্টি। লাঠিটি ভর দিয়ে ও আবার তাকায় আকাশের দিকে।

—আমি তোর শত্রু নই বিখিয়া।

—ঘাসের আগড় দরজায় বেঁধে দেব।

—আমি তোদের বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।

—এখন তো ও ঘরে রান্না করতেও পারবে না।

—তুই কি আমার কথা বুঝছিস না ?

—কা জরুরত বাবু ?

বিখিয়া হাসে, এবং লাঠিটি কাঁধে ফেলে চলে যায়। না, ওদের সঙ্গেও নেই কোনো মিলনের বিন্দু। পথ বড় সমান্তরাল. সেই সুদূর অতীত থেকে। সব জানে পূরণ, ও তো বহু বই পড়ে নিজের হোমওয়ার্ক করে তবে এসেছে পিরথায়। সেটা ওদের জানার জন্যে যতটা নয় (আসার আগে), হরিশরণের জন্যে আরও। হরিশরণ তো লিখেছিল. ম্যান, এটা প্রার্থনা।

এখানে, বিখিয়ার খোদাই করা ছবি, সমস্ত অঞ্চলটির "ডেথউইশ", তারপর পিরথার অসহ যন্ত্রণা. তারপর বর্ষা, তারপর ওদের মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা ঢুকল তারই ঘরে, এই প্রসঙ্গে বিখিয়া চলে এল তার কাছে। পরদিন থেকে পূরণকে মেনে নেয় জনপদ, সে বৃষ্টি

এনেছে, এবং বিখিয়ার সঙ্গে তার সংবাহন তখন অসামান্য তুঙ্গে। ও কি পূরণের পায়ে মাথা রেখেছিল, রোজ এনেছিল কীট-পতঙ্গ-শস্য-শ্যাওলা-সাপ-পাতার অর্ঘ্য আর পূরণকে রেখেছিল দ্বারপাল? ও কি পূরণকে নিয়ে গিয়েছিল সেই আশ্চর্য গুহায় যেখানে পাথরের দেয়ালে শিকার চলে, ঢোমরা বাজে, নাচ হয়, অরণ্য সাক্ষী থাকে? নিয়ে গিয়েছিল সেই গহ্বরের কিনারে যেটা পৃথিবীর শেষ সীমান্ত, যার পেটের মধ্যে অপেক্ষা করে থাকে আদিম অন্ধকার? তারপর আজ ব্রাহ্মমুহূর্তে ওরা তখনো তো দু-জনে ছিল একসঙ্গে।

এখন, এই স্ব-আরোপিত মৌনতার বেড়া যেই ভেঙে দিল বিখিয়া, সেই পূরণ হয়ে গেল ফালতু। ও যখন ছিল মৌন, মূক তখন ওর মূকাভিনয়, চোখ, আঙুল, কত কথা বলেছে। ও যখন মুখ খুলল তখন দেখা যাচ্ছে আসলে ওই কাছে আসাটাও ছিল একটি মিথ। বড় দুঃখ, এ মিথ বেঁচে থাকবে। সেটা মেনে নিয়েই থাকতে হবে ওকেও।

মুখে হাত বোলায় ও। পাঁচদিন পর তেলনাহান। এস. সি. রায় না কে লিখেছেন, সেদিন অশৌচান্ত ও ছোট শ্রাদ্ধ?

পূরণ নেমে যায়।

আজ বিখিয়া ঢোমরা বাজাচ্ছে এক বিরতিতে, অন্তহীন। শংকর ওর দিকে তাকায়।

আজ পাথরের ফলকের সামনে কী আছে?

পূরণ সে দিকে তাকায় না।

শংকর ওকে বলে, চলো, চা খাবে সরপঞ্চের ঘরে।

—থাকুক।

—কেন?

—আমি ঘরে থাকি, লিখি।

—চলো, তোমাকে পেঁছে দিই।

—চলো।

এখন তো কোনো ভীষণ গোপন সংবাদ অপেক্ষা করে নেই

গর্ভগৃহে। এখন সবাই আসতে পারে।

শংকর গর্ভগৃহের দিকে চায়ও না।

—চালটা মেরামত করতে হবে।

—তারপর?

শংকর গভীর মমতায় বলে, বিখিয়া যা বলে। দাহির পরিবারের যদি কেউ আসে ঘর তুলে দিব।

—তারপর? তোমরা কী করবে?

—যা করতাম! জল পেয়েছি, জমিতে নেমে যাব। একটা কথা ঠিক যে খাজড়া বাঁচায়, খাজড়া লাগাতে হবে। বাওলা বাঁচায় তো বাওলা লাগাতে হবে। নইলে সব উজাড় হয়ে যাবে, আমাদের চলে যেতে হবে।

আজ হরিশরণও ওর ঘরে আসে।

—ম্যান! ছয়টা কুয়া স্যাংশান করলাম। লাগাতার জল তো হয় না, ফাঁকে ফাঁকে কাটতে হবে।

—ঠেকেদার?

—না, ওরাই কাটবে। লোক আনবে শংকর, সরপঞ্চ সকলকে টাকায় মকাইয়ে কোদোতে দশ টাকা দেবে। শংকর বলছে ওরাই পারবে। আর, পারবে আমি জানি।

—হয়ত তাই। অনশন যার নিত্য পাওনা, কয়েকদিন খেলেই ওরা হয়ত আবার কাজে লেগে যেতে পারে।

—কৌশলজী তো সাতদিন হলেই চলে যাচ্ছে।

—আরো থাকবেন বলেছিলেন?

—মনে হচ্ছে না।

—আসলে ও'র সেই গ্রান্ড স্কীম…

—রাখো তো তুমি! আরে! এখন শুনছি অশৌচ কাটছে। পাঁচ দিন পর তেলনাহান, বিখিয়া তো কথাও বলছে।

—শুনেছি।

—রিপোর্ট, না কথা?

—দুই-ই।

—বিখিয়া এখন গুপ্ত ক্ষমতার অধিকারী। ওই জানছে কবে অশৌচ লাগল, কবে অশৌচ কাটছে।

—অন্তত আমরা যে জানি না, সেটা প্রমাণিত।

—যাক, কুয়োগুলো কোনো মিথ নয়।

—নদীর ওপারে কী?

—ফরেস্ট-এর জমি।

—ওখানে আরো গাছ লাগাও। যতটা জমি, সবটা জুড়ে। আর সব সময়ে যদি কিছু না কিছু চাষ করাতে পার, অ্যাজ লং অ্যাজ দি ল্যাণ্ড ইজ আনডার কালটিভেশন, বনবিভাগ ওদের হটাতে পারে না।

—ম্যান! সব করে দেব। শুধু তুমি কাজটা…

—হয়ে যাবে পাঁচদিনে।

—সে কি! তোমারও কি অশৌচ লেগেছে? এটা ভুল হচ্ছে পুরণ। তুমি এখানে তেলনাহান করলেও ওরা তোমাকে আপনজন বলে মানবে না এটা জেনো।

পুরণ বেদনা-মলিন হাসে।

—সে তো আমি সবচেয়ে ভালো জানি। তবু অশৌচকালে এসেছিলাম, ওদের ঘরে ছিলাম, এ ক'টাদিন…মনে কর এটা খেয়াল।

—খাওয়া নেই, দাওয়া নেই।

—ছাতু, গুড়, আচার, আর কী চাই?

—লাঞ্চ পাঠিয়ে দেব?

—রাজোরাতে খাইও।

—ম্যান! ফিরে যাও। বিয়ে কর। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাও।

—যাব, তাই যাব।

হরিশরণ আঙুল তুলে বলে এই বিয়ে না করা, কোনো নিয়ম না মানা, এগুলোকে প্রচুর তত্ত্ব দিয়ে আত্মসমর্থনে ইংরিজি বলতে পার,

কিন্তু এটা হল পলায়নী মনোভাব, ভীরুতা। দৈনন্দিন জীবনের দায় স্বীকার করার জন্যে সাহস লাগে। অর্চনার জন্যে শোক করছ আজও, এ আমি মানব না।

হরিশরণ ব্যস্ত ভালুকের মতো চলে যায়। ওর প্রেমজ বিবাহ এবং দু-জনেই খুব সুখী।

পূরণ ঘরে চলে আসে। নোটবই, ডট কলম, প্যাড। কলম কি তরবারির চেয়েও শক্তিশালী? স্কুলে এর ভাব সম্প্রসারণ লিখতে হত। পূরণকে বিশ্বাস করতে দাও, আজও, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাতেই পত্র-কারের কলম যদি জেহাদ ঘোষণা করে তা হলে জনমত তৈরি হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারও কিছু কাজ দেখায়। গুয়াতে সরকারি ঘোষণায় গুলিতে এগারো জন নিহত এবং বেসরকারি ঘোষণায় মৃতের সংখ্যা আরো বেশি হবার পর অনমনীয়, জাত ও বর্ণ ঔদ্ধত্যে উদ্ধত সিংভূম সরকারও সামান্য নড়েছিল। সেরেংসিঘাটির গভীর অরণ্যে প্রাচীন কোল বিদ্রোহের এক স্মরণীয় জায়গায় গিয়েছিল পূরণ, যেখানে হো আদিবাসীরা ধান রাখে ও রাত কাটায় উঁচু গাছের উপর কাঠের মাচানে হাতির ভয়ে, এবং সেখানে একদা বিদ্রোহীদের রক্তে লাল স্বল্পতোয়া নদীর জলে অবগাহন করে, একটি পাথর তুলে নিয়ে পকেটে রাখার পর (কী গম্ভীর ও মহান ও প্রাচীন সে ঘাটি, সে বনস্পতিগুলি, কী কথাকওয়া সেই নদী), পূরণ দেখেছিল পাহাড়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের মার্ক-টু নলকূপ, লারু জোংকো (এক লড়াকু আদিবাসী হো মেয়ে) বলেছিল, গুয়ার পর করে দিয়েছে সরকার। না, পূরণকে বিশ্বাস রাখতে দাও কলমের ওপর। তার নামকরণ "নাপ্তা নয়" তার বিয়ে "কিরিঙ্গ বৌহু বাপলা" নয়, তার পদবী "চংড়ে" এবং গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক টিকটিকি নয়, তার মৃত্যুতে মেয়েরা সৎকারে প্রধান ভূমিকা নেয় না, তার পূর্বপুরুষদের আত্মা অশান্ত হয় না, সে বছর বছর মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের শিকার নয়। সে কেমন করে ওদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে? কলম, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্রে পূরণের বিশ্বাস অটুট

রাখতেই হবে। পুরণদের আর কিছু নেই। পুরণ তো পালামৌয়ের কালাভোরি গ্রামের দাস-মজুর টেঁড়া নাগেসিয়া নয়, জ্যৈষ্ঠের উত্তাপে দামী বলদকে বাঁচাতে মালিক যাকে বাধ্য করে ধানবোঝাই গাড়ি টানতে এবং জোয়ালের নিচে পড়ে কাঁধের হাড় ভেঙে যার নব নামকরণ হয় টেঁড়া নাগেসিয়া, (টেঁড়া! বিহার মেঁ কোই নাগেসিয়া নেই হ্যায়— সরকারি সিদ্ধান্ত, তোমরা নেই), যে অপসৃয়মান অরণ্যকার দিকে দেখিয়ে বলেছিল, জঙ্গল ভি গিয়া, হাম লোগ্ ভি গিয়া।

জঙ্গল পুরণের পালয়িত্রী নয়। তার জন্য কলম।

টেঁড়াদের জন্য স্মৃতিতে ধৃত পুরাকথা।

আদি পুরাকথাও তো হারিয়ে যাচ্ছে, আঁধির মুখে ধুলো ধুলো হয়ে চলে যাচ্ছে পুরাকথা, ইতিহাস, গান, গাথা, কিংবদন্তী, লোকাচার। কেমন করে পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ আটাশ হাজার ছয়শো আটত্রিশ মানুষ পঁচিশটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ঝোড়ো বাতাস থেকে ধরে নেবে, সাজিয়ে নেবে তাদের ইতিহাস, তাদের সংস্কৃতি? শেষ অবধি তারাও কি শরণ নেবে মূলস্রোতের লেখকদের কাছে? কোনো নৃতত্ত্ববিদের লেখা পড়ে যে জানবে, ততটা লেখাপড়া শিখবে তবে তো পড়বে নাগেসিয়া। সে যদি নিজের কথা নিজে লিখত! তা তো শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসীরাও আজও লেখে না।

পুরণ কলম ধরে।

সাত

পিরথা থেকে বলছি।

পিরথা-ঢোলকি-গাবহি-ডেরহা-সাঙ্গা টৌলি-মধোলা-পুনগড় এবং ব্লকের অন্যান্য গ্রামগুলির সমস্যা একই মনে করি। এখানে সরপঞ্চ যথেষ্ট সক্রিয় নয় বলে শুনেছি। কিন্তু সরপঞ্চ বলেছে. সে প্রতিবছরই ব্লকে যায়, জানায়। হরিশরণজী প্রখণ্ড আয়ুক্ত বা ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার হয়ে আসার পর ওরা প্রথম পিরথা ও অন্যত্র দুটো করে

মাটকুয়া পেয়েছে, চাষের বীজ (যা বীজবপন কালের অনেক পরে আসে এবং ওরা খেয়ে নেয়। এই নিয়মেই ব্লকে আসে). খাদান, যা ভালপুরার মহাজনরা বকেয়া ঋণের জন্য নিয়ে নেয়, এবং কীটনাশক পেয়েছে। এ সবে খুব সুসার হয়নি, কেননা সমস্যাটি আরোই গভীরে। রাজ্য সরকার এই আদিবাসীদের মধ্যে পশ্চাৎপদ হয়ে থাকা মানুষ অধ্যুষিত আই· টি· ডি· পি· মৌজায় নিশ্চয় টাকা বরাদ্দ করেছেন জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে, এবং অডিটে সে টাকার হিসাবও মিলছে নিশ্চয়। রাজ্য সরকার আর কিছু ভাবতে প্রস্তুত নন। কিন্তু নিদারুণ সত্য হল, সরকারি আমলারা, ঠিকাদাররা ও ব্যবসায়ীরা সে টাকা খেয়ে নিচ্ছে। আদিবাসী উন্নয়নের টাকা থেকে অন্তত দশটি পথ হয়েছে কয়েক বছরে, দুটি ব্রীজ হয়েছে, এবং স্বল্পমূল্যে খাদ্য পাবার দোকানগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে খাদ্য কর্পোরেশনের পেটোয়া ডীলাররা। কণ্ট্রাকটর (যাদের রাজনীতিক গদা আছে), তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে সব। আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম চারদিনে যে, অধিকাংশ আদিবাসী ভূমিহীন। "আদিবাসী জমি হস্তান্তর নিষেধক আইন" আমূল ব্যর্থ। কেননা কৌশলী শোষকরা হয় ভুয়া আদিবাসীর নামে জমি কিনেছে, অর্থাৎ মালিককে বেচতে বাধ্য করেছে, কিংবা মালিক জানতেই পারেনি। ভূমি রাজস্ব বিভাগ ও আদালতের সহায়তাতেই এটা হয়ে চলেছে। মধোলাতে দেখলাম, কেনার অভিনয়ও করেনি কেউ। আদিবাসীর নামে জমি, তার নামে খাজনা পড়ছে. এবং আদিবাসীর সে জমিতে ঢোকার অধিকার নেই। গরিব আদিবাসী জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়বে কোন মদতের জোরে? এটা নমুনা-দর্পণ। সারা দেশে আদিবাসী জনজাতির ভূমি-মালিকানার একটা চিত্র আন্দাজ করা চলে।

পিরথার পাশের ব্লক রাওয়াগাড়ির দুটি আদিবাসী গ্রাম দেখেছি মাত্র, সরপঞ্চ সাইকেল দিয়েছিল। সেখানকার চিত্রও অনুরূপ। আই· টি· ডি· পি· মৌজায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন নামে অন্তত পঁয়ত্রিশটি প্রকল্প ও উপপ্রকল্প রেখেছে, প্রতিটির জন্য আছে বিপুল

সংখ্যক টাকা। আমি বিহার, ওড়িশা ও বাংলার কিছু আদিবাসী ইলাকায় ঘুরেছি, বিহারে বেশি। সে প্রকল্পগুলি এ রাজ্যেও আছে, টাকাও খরচ হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোনো প্রতিফলন নেই।

পিরথা ক্ষেত্রের কথাই বলি।

ওদের জমি (যখন সরকারও দেয়), পাথুরে ও অনুর্বর। অথচ সেই জমির ওপরেই ওরা নির্ভরশীল। সেচব্যবস্থা থাকলে ওই জমিতেই হয়ত কোদো ফলতে পারত, নেই। নেই যথেষ্ট পানীয় জল। পিরথা নদীতে জোড় বাঁধ দিলে ওরা দু-পাশে বনবিভাগের জমি চাষ করতে পারত, হয়নি। আশপাশের ভালো জমি খাস বিলি হয়েছে ভুয়া আদিবাসী নামে। ভালপুরা, সৌগন্ধ ও রাজৌরার তিনটি পরিবার, মাধোড়িয়া, সিং ও দেওকিয়া, এখানে কয়েক শত একর জমির বেনাম মালিক। আদিবাসীর নামে তারাই নিচ্ছে জল, সেচ, খাদান, কীটনাশক। আদিবাসীদের মহাজনও তারাই। অন্তত দশটি গ্রামের অধিকাংশ আদিবাসী ওখানে রোজ দুই থেকে আড়াই টাকা মজুরিতে মৌসুমে চাষ করে। এরাই আবার ধনী ঠিকাদার, সরকারের কাজ করে, এরাই ঋণদাতা, আর বনবিভাগের সঙ্গে সমঝোতা আছে বলে এদের বেগর লাইসেনস কাঠচেরাই মিল রোজ গজাচ্ছে।

এটাই এখানে লাগাবাঁধা দুর্ভিক্ষাবস্থার মূল কারণ। এদের নামে যা আসছে তা সরকার দেখিয়ে দেবে আদিবাসী এলাকাতেই খরচ হচ্ছে। আসলে সব লুটছে অন্যেরা। এ ব্যাপারে কোনো সমাধান করা যাবে কি না জানি না। তবে নিরপেক্ষ তদন্ত ও জমি কেড়ে নিয়ে পুনর্বণ্টন? সেও অসম্ভব। রেকর্ডে যখন মালিক আদিবাসী? আর আই. টি. ডি. পি মৌজার এই ব্যাপক লুঠতরাজে জড়িত আছে নিশ্চয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, জেলা স্তরে, এবং এটাও দেখলাম যে যেহেতু এ খাতে বাজেট বাড়ছে, এ সব মালিক বাস ও লরি কিনছে!

রাজ্য সরকার স্বভাবতই চায় না যে সব খবর বেরোক। সেজন্যই "দুর্ভিক্ষ" শব্দে এত আপত্তি। এটা শুধু "খরা"।

পিরথা, মধোলা, ডেরহা, ঢোলকি, এমন গ্রামে গ্রামে প্রতি বছরই মানুষ এ সময়ে অনশনে মরে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, জলাভাবে। টাউট জুটে যায়, এরা শিশু ও মেয়ে বেচে দেয়। টাউট ওদের এ সময়টা কুলি খাটাবার জন্যও নিয়ে যায়। ঢোলকির দুটি গোন্ড পরিবার বম্বেতে কাজ করতে গিয়ে দু-বছর বাদে নিঃস্ব কঙ্কাল হয়ে ফিরে এসেছে।

সদর এস. ডি. ও. এবং বি. ডি. ও. জানতেন যে এই ঘোষিত আই. টি ডি. পি মৌজায় (ক) আদিবাসী বেনামে কয়েকটি পরিবার সরকারি লোক ও রাজনীতিক খুঁটির জোরে আদিবাসীর জন্য যা আনছে তাই নিচ্ছে। (খ) এই নেবার ব্যাপার বিপুল অঙ্কের। যেমন এন.সি.ডি সি. প্রকল্পে সমবায় পদ্ধতিতে ল্যাম্পস মাধ্যমে ছোট ব্যবসার জন্য আশী হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা দেয়া হবে। এই প্রকল্পটি হাতাতে হলে কিছু জীবিত আদিবাসী দেখানো দরকার হয়। তেমন ভাবে সাজিয়ে আনা একটি কেস বিষয়ে ব্লক ও মহকুমা থেকে আপত্তি তোলার ফলে ক্ষমতার গোপন লড়াই এখনো চলছে। (গ) এটাকে উদ্ঘাটিত করা দরকার। (ঘ) পিরথার প্রকৃত আদিবাসীরা মানবসৃষ্ট অনশনে মরছে এটা জানানো এবং কেন এটাকে "দুর্ভিক্ষ" বলা হবে না তা ব্যাখ্যা করা এবং (ঙ) পিরথায় আশু ত্রাণ ব্যবস্থা করা দরকার।

এই ত্রাণ ব্যবস্থাও যেটুকু হল, তা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে। রাজ্য সরকার এইজন্য "দুর্ভিক্ষ" বলতে দেবে না, কারণ তাহলে বেরিয়ে পড়বে --

আই. টি. ডি. পি. মৌজা পিরথাতে আই টি. ডি. পি খাতে ও অন্যান্য খাতে যা আসে তার সুফল ভোগ করছে অন্যেরা, কিন্তু জাল আদিবাসীর নামে।

এ ব্যাপারে বহু আমলা, রাজনীতির লোক, ঠিকাদার জড়িত।

এ জন্যই সরকারি খাতে খাদ্য পেতে এত অসুবিধা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হল। যে সব সরকারি অফিসার নিলেন, তাঁরাও উভয় সংকটে এবং প্রশাসনিক কোপে পড়বেন।

বছরের পর বছর এ খাতে টাকা বেড়েছে। আর সরকারের এ নিয়ম তো আছেই, যে খাদ্য-শিক্ষা-সেচ, এমন প্রত্যেক মন্ত্রক আদিবাসী মৌজায় বাজেটের এক চতুর্থাংশ ব্যয় করবেন।

অডিটে হিসাব মিলে যাওয়া আই. টি ডি. পি. মৌজায় এসব প্রকল্পে ব্যয়িত টাকার প্রতিফলন আদিবাসী বসতিতে নেই।

আছে অন্যত্র।

সেখানে সরকার আদিবাসীর জন্য যা যা চান, তার সবই দেখা যাবে। যেমন উন্নত উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যে কৃষি, আয় বেড়ে চলা, সমৃদ্ধি, শিক্ষায় উন্নতি।

জমি যে স্বর্ণপ্রসূ, তা বলেছি।

যানবাহন, কাঠ-চেরাই কল, চোরাই কাঠ চালান, সবই বলেছি।

স্বাস্থ্য, ভালপুরায় হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, নার্সিংহোম, কী নেই শিক্ষা? ভালপুরা ও রাজৌরা মিলিয়ে একটি কো-এড কলেজ, একটি কমার্শিয়াল কলেজ, ছাত্রাবাসসহ দুটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ও নানা ক্রমের আরো আটটি স্কুল আছে।

এই সব কিছুর আমূল পরিবর্তন কে করবে? রাজ্য সরকার কেন বলতে যাবে, মাধোপুরা জেলার আই. টি. ডি পি. মৌজায় দুর্ভিক্ষ হয়ে চলে মিনি স্কেলে?

পিরথাবাসীদের কী হবে?

এবার দেখা যাক ওদের সাহায্য করার কোনো উপায় আছে কি না।

পাহাড় তো ওরা ছাড়বে না। খেতে পাক না পাক, ওটাই ওদের বিলুপ্তপ্রায় জাতিসত্তার প্রতীক। অথচ ওই জমির ফলনশীলতার ক্ষমতা খুব কম। সেচ, সার ও সময়ে বীজ পেলে ওই জমি থেকে বড় জোর চার মাসের খাবার উঠবে।

সর্বাগ্রে দরকার, ঋণের হিসাব করে, ভূমিদাসপ্রথা বেআইনী, এবং কৃষিঋণ মকুব, এর ভিত্তিতে কঠোরভাবে নিয়ম প্রয়োগ করে

ওদের দাসত্ব ও ঋণ মুক্তি।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁচবার সাহারা করতে হবে। নইলে আমার দেখা পালামৌয়ের দাস-মজুরদের মতো প্রশাসনিক ব্যর্থতার (না ইচ্ছাকৃত নির্মমতা? এ ব্যবস্থা তো চায় সামন্ত ভূস্বামী জমি রাখুক, দাস-মজুর তার দাসত্ব করুক) কারণে মুক্ত দাসরা আবার বাঁচবার জন্য ক্রীতদাস হয়ে যাবে। দাস-মজুররা কিছু খাদ্য, কিছু খাদ্যশস্য পায়, যা ওদের জীবনে এক বিরাট সাহারা।

বাঁচবার সাহারা করতে হবে একই সঙ্গে বনসৃজন করে, ওদের মুরগি ও ছাগল দিয়ে এবং অনশনের মাসগুলিতে কাজ ও খাদ্য দিয়ে। বনসৃজন করার আগে ওরাই বলবে ওরা কী গাছ চায়, কী ওদের বাঁচাবে। ছাগলের জান শক্ত, ওরা ওই ঘাস ও আগাছা খেয়েও বাঁচবে। "ওয়ার ফুটিং" শুনেছিলাম। যুদ্ধ না চালালে ওদের বাঁচানো যাবে না।

এই পর্যায়ে ওদের ওই শক্ত, মজবুত ঘাস থেকে ঝুড়ি, মোড়া বানাতে উৎসাহ দান, খাজড়ার চাটাই বোনাতে উৎসাহ দান, এবং সেগুলি বিক্রির ব্যবস্থাও দরকার।

পিরথার কুণ্ডী বাঁধান, পিরথা নদীতে অন্তত দুটি জোড় বাঁধ, ওদেরকে বনবিভাগের জমিতে চাষ করতে সাহায্য করবে। এরপর গাবহিতে স্কুল, মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার জন্য ঝুড়ি বোনা, তাঁত ও পশুপালন কেন্দ্র, একটি প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মডিফায়েড রেশন শপ করা দরকার।

"পিরথা" নামটি ব্যবহার করলাম। দরকার প্রতিটি গ্রামের জন্য।

(এই বিস্তারিত রিপোর্টটি হরিশরণ, তোমার জন্য। এরই জেরকস কপি এস. ডি ও-কে দিও। "দিবসজ্যোতির"-র জন্য অন্য রিপোর্ট লিখছি। পাঠাব। অন্যান্য কাগজকে আগ্রহী করতে চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি।—পূরণ)।

পুঃ—পাথর খোদাই শিল্পের কথাটা "দিবসজ্যোতি"র জন্যে

থাকুক। কাগজে লিখবার সময়ে অনেক "হিউম্যান অ্যাংগ্‌ল স্টোরি" দিতে পারব, যেমন নোট করেছি।

মতিয়ার মা আগেও সন্তান বেচেছে।

শংকরের নিজের ছেলে ভালপুরায় তশীলদার সিং পরিবারে দাস-মজুর হয়ে আছে।

মধোলাতে রাঘো, দাসহি এবং পুন্‌গড়ে মাধো (স্ত্রীলোক) আত্মহত্যা করার জন্যে বিষাক্ত কন্দ খায়নি। খাজড়া না পেয়ে ওরা ওই কন্দ খেয়েছিল। শোনো, খুব গুরুত্ব দিয়ে খাজড়া লাগাও তো। আমি আজ খেলাম, শংকর দিল। খাওয়া যায়।

পিরথা ও ঢোলকি থেকে যে কয়েক বছর বাচ্চা ও মেয়ে কিনছে, তার ভাইয়ের মাধোপুরা সদরে সাইকেল সারাবার দোকান আছে। সেও এ চক্রে আছে। ওই দোকানের আয় থেকে মাধোপুরায় বাড়ি করা ও মানুষ বহন করতে ট্রাক ভাড়া করা যায় না। কিনেছে দলপত ছাজন এবং ট্রাক মালিক থাকে ভিলাই।

ভালপুরা হাসপাতালে জনৈক ডাক্তার রাও সরপঞ্চকে বলেছে, এ রকম আকালের ভুখা লোকের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল করেনি সরকার। এ সব সময়ে মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।

এ বছর দাহি মরেছে অনশনে। গত বছরের আগের বছর দাহির দাদা, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে অনশনে আত্মহত্যা করেছিল।

পুন্‌গড়ের ডোগার মা বলেছে, সরকার আমাদের কোনো সাহারা করে না, খালি ভোট নেয়। ভোট নিয়ে তারা কী করে? আর সরকার কি বিলাতে থাকে যে পুন্‌গড়ের কথা জানতে পারে না?

সবচেয়ে সত্যি কথা বলেছে রাংয়াগাড়ির আদিবাসীরা। তাদের সমাজপতি থুতু ফেলে বসে থাকল। একজন প্রৌঢ় বলল, যাও যাও। পত্রকার তো দু-মাস আগেও এসেছিল। আমাদের ছবি উঠাবে? আমাদের কথা লিখবে? তাতে কী হবে? সরকার জল দেবে, না জমি দেবে, না খেতে দেবে? এই মেয়েটাকে দেখ!

একটি তরুণী মেয়ে আকাশ পানে চেয়ে বসেছিল। খেতে পেলেই ও এক মাসে সুন্দরী হয়ে উঠত।

—ওর যমজ ছেলের একটাকে বেচল, আরেকটাও মরে গেল। ওর ছবি উঠাবে?

রাওয়াগাড়িতে জনৈক মালিকের বাড়ির সামনে এঁটো পাতার এবং গড়ের মতো বাড়িটার ছবি উঠালাম। ওখানে, আজ দশদিন ধরে যজ্ঞ চলেছে, স্ত্রী পুত্র প্রসব করেছেন।

এইসব গ্রামের নামে কোটি কোটি টাকা কয়েক বছরে খরচ হয়েছে। মহান আদিবাসী মঙ্গল পরিকল্পনার প্রতিফলন কী রকম, তার ছবি তুলেছি।

"আদিবাসীর জন্য গৃহ নির্মাণ", কয়েকটি ভাঙা, খুঁটি সর্বস্ব ঘরের চিত্র।

"পশুপালনে সাহায্য"—সোনা গোণ্ড তার শেষ ছাগলটি বেচতে নিয়ে যাচ্ছে।

"নিবিড় শিশু ও মা প্রযত্ন প্রকল্প"—তিনটি কঙ্কালিনী চারটি কঙ্কাল অথচ পেটফোলা শিশু নিয়ে বসে আছে।

"আদিবাসীর জন্য অরণ্য প্রকল্প"—"ইহা বনবিভাগীয় জমি" লেখা সাইনবোর্ড ও কাঁটাতারে ঘেরা আদিগন্ত মাঠ।

"আদিবাসীর জন্য পানীয় জল"—টিউবওয়েলের কঙ্কাল মুখ থুবড়ে পড়ে আছে প্রথম ছবি। দ্বিতীয় ছবি, পঞ্চায়েতী কুয়ার সামনে দূরে কলসি নিয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েরা এবং এক গব্বর সিং এক মোটা মহিষকে স্নান করাচ্ছে। তৃতীয় ছবি, গিরথা নদীর বুক থেকে মেয়েরা জল নিচ্ছে।

"আদিবাসীদের চাষ পদ্ধতিতে বিপ্লব"—পাহাড়ের গায়ের ঢালে ফুটি-ফাটা শূন্য জমি, একটি বিভ্রান্ত শিশু থমকে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার চোখে সপ্রশ্ন চোখ রেখেছে।

"আদিবাসীদের জন্য সুলভ মূল্যে খাদ্য"—এক বৃদ্ধা খাজড়ার

কন্দ তুলে দেখাচ্ছে।

"এখানে দুর্ভিক্ষ নেই," —পথের পাশে হেঁটে চলেছে কঙ্কাল মানুষেরা মাথায় চাটি নিয়ে, মেয়ে ও শিশুদের হাত ধরে। মাইলস্টোনে তীর চিহ্ন দেখ, ভালপুরা দশ কিলোমিটার।

এ সব ছবি, হরিশরণ, কোনো সত্যকে কোনো মিথ্যাকে প্রকাশ করবে।

সত্য যা, মিথ্যাও তাই।

সত্য, আদিবাসী প্রাপক কিছুই পায় না।

মিথ্যা, সরকারের সব কাগজে ঘোষণা, কাজের বেলা সরকার কিছু করে না।

শেষ ছবিটি দেখ।

একটির মধ্যে একটি ফ্রেম করে তিনটি বাড়ির ছবি। "আদিবাসী উন্নয়নের প্রকৃত প্রাপকদের বাড়ি"। নাম আগে বলেছি, আবার দেব। অবশ্য লিখব, "শোনা যায় এই সব বাড়ির মালিকরা জাল আদিবাসীদের নামে রেকর্ডেড জমিতে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করেন।"

এরপর তুমি সামলিও।

আবারও, পূরণ।

"তেলনাহান" খুব নীরবে হয়ে যায়।

পূর্বপুরুষের আত্মার অবয়বী রূপের একমাত্র আবিষ্কারক বিঁথিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে সকলকে একটা ছোট বাটি থেকে কাঠির ডগায় তেল দেয়।

জীবিতের সৎকারের পর যে নিয়ম, পূর্বপুরুষদের আত্মার অবয়ব বিষয়ে সে নিয়ম কেন পালন করে এ বালক। তা কেউ জিজ্ঞাসা করে না।

সে কি তার মৃত্যু দেখেছে?

কোনো প্রশ্ন নেই।

সে কি তার সৎকার করেছে?

কোনো প্রশ্ন নেই।

তবে তড়িৎতরঙ্গে চলে উত্তেজনার নীরব প্রবাহ।

পূর্বপুরুষদের আত্মা এভাবে এসেছিল? আসেনি?

জানে, পিরথা জানে।

ভীষণ সংবাদে ওদের অশৌচ হয়ে গিয়েছিল? পিরথা জানে, পিরথা জানে।

তেলনাহানের পর আরো তো কত কৃত্য থাকে, সে সব পিরথা যা হয় করবে।

পূরণ বোঝে, আদিবাসীদের বিপন্ন অস্তিত্বের, জাতিসত্তার বিলুপ্তির সংকট ওদের অন্ধকারের দিকে ঠেলছিল আর ঠেলছিল।

বিখিয়ার কপিশ পিঙ্গল চুল, সদ্য ক্ষৌর করা মুখ, দেখতে দেখতে ও বুঝেছিল যে সরকার ও প্রশাসনের নির্মম ঔদাসীন্যের ব্যাখ্যা এ জগতে খুঁজে খুঁজে ওরা হেরে যাচ্ছিল। সে সময়ে ওই ডানা মেলা পাখির ছায়া ফিরে আসে একাধারে মিথ এবং ব্যাখ্যা হয়ে।

এ এক নতুন মিথ। কেননা দীর্ঘকাল আগের মৃতদের আত্মা শত শত বছর বাদে ফিরে আসবে অজানিত চেহারার ক্লান্ত পাখির রূপে। এমন কথা হয়ত ওদের ওরাল ট্রাডিশনেও নেই।

কিন্তু এখন থেকে ওরা দুঃখে দুর্দিনে প্রতীক্ষা করবে সেই ছায়ার জন্যে, নইলে যে এ বঞ্চনার মানবীয় ব্যাখ্যা করা যায় না।

বিখিয়া ওই ফলক এঁকে এই নতুন মিথের রক্ষী। ওই রক্ষা করবে।

আর এই অশৌচ, এই "তেলনাহান" ওদের রক্তে একটা ভরসা দিয়েছে। এবার এমন কিছু ঘটেছে, যা ওদের নিজস্ব, এবং বাইরের মানুষের বোধ ও আয়ত্তের ও আক্রমণের ও লুণ্ঠনের নাগালের বাইরের ব্যাপার।

এই সকলের ক্ষৌর করা, স্নান করা, এটা ওদের সত্যিই শুচি করছে। সকলের চোখ মুখ খুব অন্যরকম, পূরণের ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরে। কোনোদিন কি পূরণ নাগাল পেয়েছিল?

দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে, কাঁধে ঝোলা নিয়ে পূরণ নেমে আসে। বিখিয়া এখন কী আত্মমগ্ন, কী শান্ত, কী সুন্দর, পূরণের বুক কেঁপে যায়।

চলি বিখিয়া।

—হ্যাঁ বাবু।

"আবার এসো" বলে না ও, বলে না কেউ। শংকর ম্লান হেসে বলে, খরার সময়ে এসো।

—বৃষ্টির মেঘ ধরতে পারি, তবে তো!

শংকর বলে, কেমন করে যাবে?

—নেমে যাই। কোনো ট্রাক পেয়ে যাব।

—সুপণ্ডজী?

তুমি বলে দিও।

—ব্লক সরকার আজ আসবে না?

—না।

—আর রিলিফও তো বন্ধ হবে।

—শুনেছি।

শংকর আস্তে বলে, ব্লক সরকার কী ভাবছে জানি না। আমরা কিন্তু পিরথা ছেড়ে যাব না।

চারদিকে চেয়ে বলে, কেন যাব? এই তো আমাদের জায়গা, না? এখন কোনো আদিবাসী যাবে না। পূর্বপুরুষের আত্মা যত জায়গা দিয়ে ঘুরেছে, তা আমাদের, তাই ত জানিয়ে গেল। আর কি কেউ যেতে পারে, না যাবে?

—তাই জানিয়ে গেল? কে বলল?

—বিখিয়া।

সগৌরবে বলে শংকর।

মাথা নাড়ে, মাথা নাড়ে পূরণ। এই পাথর, পাহাড়, গুহা ও নদী ছেড়ে ওরা যাবে না কোথাও। কোনো শস্যসম্ভবা কৃষিক্ষেত্রে, কোনো

সমতলে, যেখানে জল অফুরান, বাঁচার সাহারা অনেক।

—দিতে হলে এখানে দিয়ে যাক সাহারা।

হাত ছড়িয়ে বলে, ও সব জমি আমাদেব ছিল, আমাদের কাছ থেকে রাজারা নেয়। আবার তো আমাদের দেবার কথা ছিল, কাদের দিল? না, আমরা যাব না কোথাও। যা দেবার তা এখানে দিয়ে যাক।

—বলব।

—না দেবে তো ভুলে যাক, ভুলে যাক আমাদের। বড় জোর মরে যাব, তার বেশি তো নয়।

কোনো কোনো বিরল মৃত্যু মিথ্ হয়ে উঠে আসে অন্ধকার গহ্বর থেকে। কিন্তু পূরণ তা বলে না।

—চলি শংকর!

—হ্যাঁ বাবু।

জরিপের ম্যাপের জানোয়ারটার পিঠ থেকে লেজে পেঁছনো, গাবহিতে নামা, চোখের বাষ্প মুছতে মুছতে অবশেষে পথে থেমে ট্রাকের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা,—কত কাল কেটে যায়?

সাড়ে সাতশো কোটি বছর?

পাঁচ হাজার বছর?

পিরথা পাহাড়কে পিছন ফিরে দেখার দরকার নেই। পিরথা জনপদকে পূরণ বুকে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রাজোরাও ছাড়তে হবে আজ।

মাধোপুরা যাওয়ার দরকার নেই।

পিরথাই সব, অন্য সব জায়গা এখন মনে হচ্ছে খুব, খুব তুচ্ছ।

হরিশরণকে ও কী বলবে?

হরিশরণ ওকে কী বলবে?

-হরিশরণ, হরিশরণ, পিরথা কাহিনীর শেষ অভিজ্ঞতা কী জানো?

—কী? কী? কী?

—আমরা হেরে গেছি কোথাও বিখিয়াদের, পিরথার কাছে। প্রাচীন সভ্যতার কাছে আধুনিক অগ্রগতি তুলনায় অন্তরে অনেক বর্বর। আমরা পরাজিত।

—আর?

—শেষ কথা কি জানো? টেরোড্যাকটিলের সঙ্গে আমাদের কোনো সংবাহন-বিন্দু নেই। আমরা দুই পৃথিবীর এবং নো কম্যুনিকেশন পয়েন্ট। টেরোড্যাকটিলের ব্যাপারটায়, ও বাস্তব-অবাস্তব যাই হোক, একটা মেসেজ ছিল আমরা ধরতে পারলাম না। মিস্ করে গেলাম। ভীষণ ক্ষতি হল আমাদের, অথচ আমরা তা জানলাম না! প্রথম থেকেই টেরোড্যাকটিল মিথ ও মেসেজ। আমরা বাস্তব টেরোড্যাকটিলের আবিষ্কারের আতঙ্কে কেঁপে গিয়েছিলাম।

—আর পিরথা?

—আদিবাসীদের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগের কোনো সংবাহন-বিন্দু তৈরি করিনি আমরা। অনাবিষ্কৃত রেখেই ধীরে, সভ্যতার নামে, ধ্বংস করেছি এক মহাদেশ। নো কম্যুনিকেশন।

—একেবারে নেই?

—একেবারে নেই।

—সেটা গড়ে তোলা কি অসম্ভব?

—গড়তে হলে যে অসম্ভব ভালবাসতে হয় বহুকাল ধরে। কয়েক হাজার বছর ধরে আমরা ওদের তো ভালবাসিনি, সম্মান করিনি। এখন সময় কোথায়, শতাব্দীর শেষ সময়ে? সমান্তরাল পথ, ওদের পৃথিবী আমাদের পৃথিবী আলাদা, ওদের সঙ্গেও কোনো প্রকৃত আদান-প্রদান হয়নি, যা আমাদের সমৃদ্ধ করত।

—আর···টেরোড্যাকটিলের ছবি?

—বিখিয়া জানে।

পূরণ মনে মনে সংলাপটি বারবার বলে দু-জনের হয়ে। হ্যাঁ,

এটাই তো সত্যি। আমরা হেরে গেছি।

টেরোড্যাকটিল কী বলতে এসেছিল পূরণের কাছে, শরণার্থী হয়ে, সম্ভবত বিখিয়া তা বুঝেছে।

পূরণ বোঝেনি।

হরিশরণ, হরিশরণ! বুঝিনি আমরা, বুঝতে চাইনি বলে এবং এখন দেখা যাচ্ছে বিখিয়ারা শেষ পর্যন্ত অনেক সভ্য, প্রাচীন সভ্যতার ধারক, সে জন্য ওরা শেখেনি আমাদের বর্বরতা, ওদের ভাষাতেও বোধহয় "শোষণ" শব্দের প্রতিশব্দ নেই। আমাদের দায়িত্ব ছিল ওদের রক্ষা করবার। ওদের চোখ তাই বলছিল।

ভালবাসা, প্রচণ্ড, নিদারুণ, বিস্ফোরক ভালবাসা পারে এ কাজে এখনো আমাদের ব্রতী করতে শতাব্দীর সূর্য যখন পশ্চিম গগনে, নইলে ভীষণ দাম দিতে হবে এই আগ্রাসী সভ্যতাকে, প্রতিবার আগ্রাসী সভ্যতা নিজেকে ধ্বংসই করে অগ্রসরণের নামে, ইতিহাস দেখ।

ভালবাসা, নিদারুণ ভালবাসা, তাই হোক প্রথম পদক্ষেপ। এখন পূরণের বিমূঢ় হৃদয় আবিষ্কার করে পিরথার প্রতি কী ভালবাসা তার হৃদয়ে আর বুঝি তার দূরের দর্শক থাকা চলে না জীবনের কোথাও।

টেরোড্যাকটিলের চোখ।

বিখিয়ার চোখ।

হে প্রাচীন সভ্যতা, ভারতবর্ষের সভ্যতার ভিত্তিভূমি, ধারয়িত্রী হে আদি সভ্যতা, আমরা আসলে পরাজিত। এক মহাদেশ! তাকে অনাবিষ্কৃত রেখেই ধ্বংস করে দিলাম, যেমন ধ্বংস করছি আদি অরণ্য, জল প্রাণী, মানুষ।

একটি ট্রাক কাছে আসছে।

পূরণ হাত তোলে, এগোয়।